সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি

আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক

অনুবাদ
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা-৫৯
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫

الأصول العلمية للدعوة السلفية

تأليف : عبد الرحمن عبد الخالق (الكويت)

الترجمة البنغالية : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب

الأستاذ فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث للطباعة والنشر)

১ম প্রকাশ
শা'বান ১৪০৫ হি./মে ১৯৮৫ খৃ.

২য় সংস্করণ
যিলহাজ্জ ১৪৩৭ হি./ আশ্বিন ১৪২২ বাং/ সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রি.

মুদ্রণ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য
৩৫ (পয়ত্রিশ) টাকা মাত্র।

Salafi Dawater Mulniti (Basic Principles of Salafi movement) by **Abdur Rahman Abdul Khaleque (Kwait)** Translated into Bengali by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib**, Professor, Department of Arabic, University of Rajshahi. Published by : **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph & Fax : 88-0721-861365. Mob: 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org.

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

(كلمة المترجم فى الطبعة الأولى)

‘নাহমাদুহু ওয়া নুছাল্লী আ‘লা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা‘দ-

১৯৮৪ সালের গোড়ার দিকে অত্র الأصول العلمية للدعوة السلفية বইটি আমাদের হাতে এলে কিছুদিনের মধ্যেই তা পড়ে ফেলি। নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের সঠিক পথনির্দেশ এতে আছে দেখতে পেয়ে অনুবাদে হাত দেই। অনুবাদ অল্প দিনেই শেষ হয় এবং পরের বছর ছাপা হয়।

আহলেহাদীছ আন্দোলন ও সালাফী দাওয়াতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বইটির প্রথম অধ্যায়ে সালাফী দাওয়াতের প্রধান তিনটি মূলনীতি তাওহীদ, ইত্তেবা ও তাযকিয়াহ ২য় অধ্যায়ে চারটি উদ্দেশ্য এবং ৩য় অধ্যায়ে তিনটি বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। লেখকের জ্ঞানগর্ভ দু’টি ভূমিকা সহ সার্বিক আলোচনাটি কুরআন ও সুন্নাহ্র নিরপেক্ষ অনুসারী প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অত্যন্ত উপকারী হবে বলে আশা করি।

বইটির কুয়েতী লেখক শায়খ আব্দুর রহমানকে জানি না। কিন্তু তার লেখার সঙ্গে পরিচিত হয়ে দূর থেকে অন্তরের সেতুবন্ধ রচিত হ’ল। আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে জাযায়ে খায়ের দান করুন- আমীন!

অনুবাদটি প্রকাশের ব্যাপারে যিনি সবচাইতে বেশী অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এবং মূল্যবান আরবী ভূমিকা লিখে দিয়ে বইটির রওনক বৃদ্ধি করেছেন, সেই বন্ধুবর সঊদী মাব‘ঊছ ভাই আব্দুল মতীন সালাফীকে রইল আন্তরিক মুবারকবাদ।

পরিশেষে যাদের ঐকান্তিক আগ্রহ-আতিশয্যে দ্বীনী ইলমের পথে পা বাড়িয়েছিলাম, সেই পরম স্নেহশীল পিতা-মাতার উদ্দেশ্যে রইল প্রাণখোলা দো‘আ ‘রব্বিরহামহুমা কামা রব্বায়ানী ছগীরা’। ওয়া আখিরু দা‘ওয়ানা ‘আনিল হামদু লিল্লাহি রব্বিল ‘আলামীন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় — বিনীত

৭ই মে ১৯৮৫ইং/১৬ই শা‘বান ১৪০৫ মঙ্গলবার — অনুবাদক

২য় সংস্করণে অনুবাদকের কথা

(كلمة المترجم فى الطبعة الثانية)

২য় সংস্করণে অনুবাদের ভাষা ও ভাবে অনেকটা পরিবর্তন ও সংশোধনী এসেছে, যেটা স্বাভাবিক। এতে পাঠক অনেক বেশী উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ। ইতিমধ্যেই আমরা জেনেছি যে, বইটি আরবী ভাষায় সংক্ষেপে লিখিত সালাফী দাওয়াতের উপরে শ্রেষ্ঠ বই। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ*। বর্তমান অনুবাদে আমরা প্রয়োজনীয় টীকা ও ব্যাখ্যা সংযোজন করেছি। অতঃপর দীর্ঘ ৩১ বছর পরে এ মহতী কাজটি আল্লাহ আমাদের মাধ্যমে পুনরায় করিয়ে নিলেন, সেজন্য তাঁর প্রতি রইল হাযারো শুকরিয়া।[১]

নওদাপাড়া, রাজশাহী বিনীত-
২৮শে সেপ্টেম্বর ২০১৬/২৫শে যিলহাজ্জ ১৪৩৭ বুধবার। অনুবাদক।

আল্লাহ বলেন, وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُـــونَ- 'বস্তুতঃ সত্য যদি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুগামী হ'ত, তাহ'লে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এর মধ্যবর্তী সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেত। বরং আমরা তাদেরকে উপদেশ (কুরআন) দিয়েছি। কিন্তু তারা তাদের উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়' *(মুমিনূন ২৩/৭১)*।

১. এই সাথে মাননীয় অনুবাদক প্রণীত আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? (৫৬ পৃ.), ফিরক্বা নাজিয়াহ (৫৬ পৃ.) এবং আহ্লেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (৫৩৮ পৃ.) ডক্টরেট থিসিস গ্রন্থটি পাঠের পরামর্শ রইল। -প্রকাশক।

بسم الله الرحمن الرحيم

সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি সমূহ

(الأصول العلمية للدعوة السلفية)

লেখক কর্তৃক ১ম সংস্করণের ভূমিকা

(مقدمة الطبعة الأولى من المؤلف)

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর সাহায্য কামনা করি ও তাঁরই নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করি। আমরা আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি আমাদের মনের যাবতীয় মন্দ চিন্তা ও অন্যায় কর্মসমূহ হ'তে। কেননা তিনি যাকে হেদায়াত দান করেন, তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে পথ দেখাবার কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, লা-শরীক আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল।

অতঃপর শ্রেষ্ঠ বাণী হ'ল আল্লাহ্‌র বাণী এবং শ্রেষ্ঠ হেদায়াত হ'ল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হেদায়াত। আর নিকৃষ্টতম কর্ম হ'ল ইসলামের নামে সৃষ্ট নতুন নতুন অনুষ্ঠান সমূহ। কেননা ধর্মের নামে প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদ'আত। আর প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম *(আবুদাঊদ হা/৪৬০৭; নাসাঈ হা/১৫৭৮)*।

অতঃপর মুসলিম জাতি তার দীর্ঘ ইতিহাসে বহু বড় বড় ফিৎনার সম্মুখীন হয়েছে এবং এই দ্বীনের মধ্যে রকমারি বিদ'আত ও গুমরাহী ঢুকে পড়েছে। পবিত্র কুরআনে নানাবিধ তাহরীফ (পরিবর্তন) ও সন্দেহবাদ আরোপ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত কখনো বানোয়াট ও জাল করার সম্মুখীন হয়েছে। কখনো তা রদ অথবা বাতিল করার সম্মুখীন হয়েছে। উপরোক্ত বিষয় সমূহের যেকোন একটিই দ্বীনের চিহ্নসমূহ মুছে দেওয়ার ও তার মূলনীতি সমূহ বিনষ্ট করার এবং দ্বীনের চেহারা পরিবর্তন ও ধ্বংস করে দেবার জন্য যথেষ্ট। যদি আল্লাহ স্বীয় প্রেরিত দ্বীনের হেফাযতের ইচ্ছা না

করতেন এবং দ্বীনের মধ্যে সীমালংঘনকারীদের তাহরীফ বা পরিবর্তনের ও বাতিলপন্থীদের জালিয়াতির কলাকৌশল সমূহ ব্যর্থ করে না দিতেন এবং প্রতি যুগে এদের যাবতীয় কূট প্রচেষ্টা বিফল করে দেবার মত যোগ্য বান্দা সৃষ্টি না করতেন, তাহ'লে ইহূদী-নাছারাদের ধর্মের ন্যায় আমাদের এ দ্বীনের তরীকাও মিটে যেত।

দ্বীনের এই সংশোধন ও সংস্কার আন্দোলনই হ'ল সালাফী (বা আহলেহাদীছ) আন্দোলন, যা দ্বীনের মূলনীতিগুলিকে পরিচ্ছন্ন ও নির্ভেজালরূপে হেফাযত করেছে। এ থেকে সমস্ত বিদ'আতকে ছাটাই করেছে। সকল ভ্রান্তি দূর করেছে। যাবতীয় অপব্যাখ্যা ও পরিবর্তন সমূহ সংশোধন ও পরিশুদ্ধ করেছে।

ন্যায়নিষ্ঠ ছাহাবীগণ (আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হৌন!) তাঁদের নিকট রক্ষিত (হাদীছের) আমানত পূর্ণভাবে আদায় করেছেন এবং কোনরূপ কাটছাট না করেই তা লোকদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। সব রকমের বাতিল ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে তাঁরা ছিলেন সদা জাগ্রত। তাদের পরে এই ঝাণ্ডা বহন করেন তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈগণ এবং তাদের পরবর্তীগণ। এ সময় ইসলামী খেলাফতের সীমানা বিস্তৃত হয় এবং পারস্য, রোম ও অন্যান্য জাতি ইসলামে প্রবেশ করে। তাদের অনেকেই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় দ্বীনের মধ্যে এমন সব বিষয় প্রবেশ করাতে চায়, যা কখনোই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়।

সালাফী বিদ্বানগণ এর বিরুদ্ধে কিতাব ও সুন্নাতের পাহারাদার হিসাবে দাঁড়িয়ে যান এবং এ রাস্তায় তাদের জিহাদের ইতিহাস আমাদের জন্য সংরক্ষণ করে যান। তাঁরা বাতিলপন্থীদের বিরুদ্ধে শাসন ও রাজনীতির ক্ষেত্রে এবং জীবনের সকল দিক ও বিভাগে খালেছ দ্বীনের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য দণ্ডায়মান হন। যার ফলে তারা পরবর্তীদের জন্য ইল্ম ও ঈমানের ঝাণ্ডাকে নিরাপদ করে যেতে সক্ষম হন।

চিরকাল এই দ্বীন যুদ্ধের ময়দানে প্রবেশ করেছে তার একনিষ্ঠ লোকদের নিয়ে এবং পুণ্যবান ও বরকতময় সন্তানদের নিয়ে, যারা আনুগত্যকে কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্য খালেছ করেছেন। তারা আল্লাহ্র কিতাবের উপর ঈমান এনেছেন যেভাবে তা নাযিল হয়েছে এবং ঈমান এনেছেন রাসূল (ছাঃ)-এর

সুন্নাতের উপরে, ঠিক যেভাবে তা এসেছে। তাঁরা এ দু’টিকে কঠিনভাবে আঁকড়ে থেকেছেন এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছেন। আর তাঁরা প্রত্যেক অপবাদ দানকারী পাপীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, যারা এই দ্বীনের চারণ ভূমিতে পরিবর্তন, কমবেশীকরণ ও কাটছাটের দূরভিসন্ধি করেছে।

আমাদের এই যুগে দ্বীনের উপর হামলা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে এই শতাব্দীতে দ্বীনের ব্যাপক নেতৃত্ব এবং সর্বব্যাপী সম্মানের কারণে অবিশ্বাসীদের অন্তঃকরণ গোস্বায় ফেটে যাচ্ছে। তারা মুসলিম উম্মাহ্র মর্যাদা ও বিজয়ের মূল উৎস তাদের প্রতিপালকের কিতাব ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের প্রতি মুসলিম সন্তানদের উদাসীনতা লক্ষ্য করেছে। তারা নিজেদের গর্দান থেকে তরবারি নামিয়ে রেখেছে এবং ঐসব লোকদেরকে দ্বীনের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টির কাজে লাগিয়ে দিয়েছে, যারা এর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে। তারা প্রথমে নিজেদের সন্তানদের এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। অতঃপর মুসলিম সন্তানদেরকে তাদের ছাত্র হিসাবে গ্রহণ করেছে। ফলে তারা ওদের ভাষায় কথা বলে এবং ওদের ন্যায় চিন্তা করে। অবশেষে মুসলিম সন্তানেরাই ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পিছন থেকে কিতাব ও সুন্নাহকে তীরবিদ্ধ করে।

এই ধ্বংসকারী ফিৎনার বিরুদ্ধে কেবলমাত্র ঐ সমস্ত লোকই ছিলেন, যারা প্রথম যুগের তাহযীব-তামাদ্দুন ও তরীকার উপর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। যে তরীকাতেই ছিল প্রকৃত সম্মান, নেতৃত্ব, বিজয় ও শাসন কর্তৃত্ব। আল্লাহ রহম করুন ইমাম মালেক (রহঃ)-এর উপর। তিনি কত সুন্দরই না বলতেন, لَا يُصْلِحُ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ إلاَّ مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا ‘এই উম্মতের শেষের লোকদের অবস্থা সংশোধিত হবে না ঐ বস্তুর মাধ্যমে ব্যতীত, যা তার প্রথম যুগের লোকদের অবস্থা সংশোধন করেছিল (অর্থাৎ কুরআন ও হাদীছ)’।[২] ছাহাবীগণ কিতাবুল্লাহকে জানতেন, যেমনভাবে তা নাযিল হয়েছিল। সুন্নাহকে জানতেন

---

২. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ১/২৪১। মাননীয় লেখক এখানে لا يصلح أمر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها লিখেছেন। আমরা বক্তব্যটির সূত্র কোথাও খুঁজে পাইনি।

যেমনভাবে তা পৌঁছেছিল, প্রথম যুগের বিদ্বানগণের যুগ পরম্পরায় অনুসৃত মূলনীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী। অতঃপর তাঁরা দাঁড়িয়ে গেছেন বাতিলের বিরুদ্ধে যা বর্তমান পৃথিবীকে প্রায় পরিপূর্ণ করে ফেলেছে। আল্লাহ স্বীয় কর্মের উপর বিজয়ী। তিনি চান যে, এই উম্মতের মধ্যে একটি দল থাকুক, যারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত হকের উপরে বিজয়ী থাকবে।

এই সংক্ষিপ্ত বইয়ের মধ্যে স্পষ্ট বিবরণ দান করা হয়েছে ঐ মূলনীতি সমূহের, যে সবের উপর কিতাব ও সুন্নাহ্র বুঝ ও তদনুযায়ী আমলের বিষয়ে প্রথম যুগের বিদ্বানগণের মাযহাব ভিত্তিশীল ছিল। আমরা এতদ্বারা তাদের পথের পথিকদের জন্য তাদের তরীকা ব্যাখ্যা করতে চাই। যাতে দ্বীনের মধ্যে কোন ভেজাল মিশ্রিত হ'তে না পারে এবং ধ্বংসকারী বাঁকা পথ সমূহের কারণে মানুষের নিকট প্রকৃত 'ছিরাতে মুস্তাক্বীম' অন্ধকারে ঢাকা না পড়ে।

পৃথিবী যতদিন থাকবে ততদিন পর্যন্ত যেন এই বইয়ের দ্বারা মানুষ উপকার লাভ করে এবং এটি যেন কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হয় সেজন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা জানাই। তিনি সর্বশ্রোতা ও দো'আ কবুলকারী।

আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক
কুয়েত, রবীউল আখের, ১৩৯৫ হি.*

* মাননীয় লেখক প্রথা মতে 'রবীউছ ছানী' লিখেছেন। যা ঠিক নয়। কেননা আরবী মাসে 'রবীউছ ছালেছ' নেই।

লেখক কর্তৃক ২য় সংস্করণের ভূমিকা

(مقدمة الطبعة الثانية من المؤلف)

আল্লাহ্র প্রতি যথাযোগ্য হাম্‌দ এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম শেষে প্রায় সাত বছর পূর্বে অত্র বইয়ের ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন এলাকার সালাফী ভাইয়েরা তা লুফে নেন। কেউ কেউ কলম দিয়ে নকল করে নেন, কোথাও বা একটি কপি পর পর কয়েক জনে পালা করে পড়েছেন। কেউবা ফটোকপি করে নিয়েছেন এবং বিভিন্ন এলাকায় বিতরণ করেছেন। এসবই আল্লাহ্র একান্ত মেহেরবানীতেই সম্ভব হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত কলেবরে হ'লেও বইটি আল্লাহ্র রহমতে তার বিষয়বস্তুকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে সমর্থ হয়েছে। সালাফী তরীকার দিক নির্দেশনায় এবং ইসলামী রিসালাতের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যায় এই বই পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। যা সালাফী দাওয়াতের উদ্দেশ্যসমূহ স্পষ্ট করেছে এবং সালাফী তরীকার মূলনীতি সমূহ রচনা করেছে। যা ইসলাম বুঝা ও তার উপর আমল করার জন্য স্থায়ী পদ্ধতি। যা আল্লাহ্র রহমতে উম্মতের একমাত্র মুক্তির পথ এবং এটাই উম্মতের সম্মান ও বিজয়ের পথ। আল্লাহ্র রহমতে আমরা তার বরকত ও প্রমাণ সমূহ প্রত্যক্ষ করেছি। এই অনুপম সালাফী তরীকা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে সালাফে ছালেহীন তথা ইসলামের প্রাথমিক যুগের হকপন্থীদের যথার্থ তরীকার উপর ভিত্তি করে তার চরিত্র, গুণাবলী, ইলম ও আমল অনুযায়ী। এই দ্বীনের বিস্ময় সমূহ শেষ হবার নয়। তার খনি সমূহ ফুরাবার নয়। এই উম্মতের মধ্যে চিরদিন একটি দল হকের উপরে বিজয়ী থাকবে। যাদের শেষ দল দাজ্জালের সঙ্গে লড়াই করবে।

আলহামদুলিল্লাহ, আমরা সালাফী ভাইদের দেখতে পাচ্ছি যে, তারা উক্ত তরীকার উপরে চলছেন। তারা ইসলামকে যথার্থ রূপে বুঝেছেন এবং তাকে নিজেদের জীবনে রূপায়িত করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা পূর্ণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার সাথে আল্লাহ্র দিকে আহ্বানের অপরিহার্য দায়িত্ব স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন। তাঁরা মুসলিমদের আক্বীদা, আমল ও আচরণগত যেকোন বিচ্যুতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেছেন এবং বাতিলপন্থীদের মোকাবিলায় সার্বিক জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছেন। আল্লাহ্র জন্যই যাবতীয় প্রশংসা যে, এই দলের মঙ্গলময় অগ্রযাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সংশয় ও তার নিরসন : অলস লোকদের হামলা থেকে আজকের সালাফী আন্দোলন নিরাপদ নয়। তারা সবসময় এই দাওয়াতের পিছনে সন্দেহ সৃষ্টির কাজে লিপ্ত রয়েছে। আল্লাহ্‌র জন্য সমস্ত প্রশংসা যে, এই সব সন্দেহ চিরদিন পায়ের তলে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সময়ের তালে তাদের সকল গোমর ফাঁক হয়ে গেছে এবং সালাফে ছালেহীনের তরীকায় ইসলামকে বুঝবার চেষ্টায় রত প্রাথমিক ছাত্রটিও এখন এইসব সন্দেহবাদের মোক্ষম জবাব দিতে সক্ষম।

সংশয়গুলির মধ্যে উদাহরণ স্বরূপ :

১ম সংশয় : আপনারা কেন নিজেদেরকে সালাফী বলেন? অথচ তা কিতাব ও সুন্নাহতে নেই। উত্তরে আমরা বলি যে, সংগত কারণে কোন নাম গ্রহণ করা মোটেই অন্যায় নয়। চাই তা কোন শারঈ বিষয়ে হৌক বা অন্য কোন মুবাহ (জায়েয) বিষয়ে হৌক। শারঈ বিষয়ে এই ধরনের নামকরণ বরং ওয়াজিবের পর্যায়ে পড়ে। যেমন মুসলিমগণ ইলমে ইসনাদ বা হাদীছের সনদ সমূহের বিদ্যায় 'মুছত্বালাহুল হাদীছ' (مصطلح الحديث) পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন। যদিও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে এ ধরনের ইলমের কোন অস্তিত্ব ছিল না এবং তা বিদ'আতও নয়। কেননা এর একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ সমূহের হেফাযত ও সংরক্ষণ।

এমনিভাবে কোন মুসলিম 'মুহাজেরীন' হিসাবে অভিহিত হয়েছেন (মক্কা থেকে মদীনায়) হিজরতের কারণে। কেউ 'আনছার' হিসাবে আখ্যায়িত হয়েছেন (মুহাজিরগণের) সাহায্যকারী হওয়ার কারণে। কেউ 'তাবেঈ' হিসাবে পরিচিত হয়েছেন পূর্ববর্তী মুহাজিরীন ও আনছার ছাহাবীদের শিষ্য হওয়ার কারণে। যাদের ব্যাপারে কল্যাণের সাক্ষ্য দান করা হয়েছে।[৩]

এক্ষণে এতে কোন্ ক্ষতি রয়েছে যে, আমরা আমাদের 'সালাফী' নামকরণ করেছি? যারা দ্বীন বুঝার ক্ষেত্রে সালাফে ছালেহীনের পদ্ধতির অনুসরণ করে। আর সালাফে ছালেহীন যাদের আমরা অনুসরণ করি, তারা হ'লেন ছাহাবা ও আল্লাহ্‌র রহমতে তাদের শিষ্য তাবেঈগণ। যারা হ'লেন স্বর্ণযুগের মানুষ।

---

৩. 'সালাফ' আরবী শব্দের বাংলা অর্থ হ'ল- পূর্ব পুরুষগণ। সেই অর্থে 'সালাফে ছালেহীন' বলতে সৎকর্মশীল পূর্বপুরুষগণ। যার দ্বারা ছাহাবা, তাবেঈন ও বিগত যুগের মুহাদ্দিছগণকে বুঝানো হয়।

আর এই নামকরণ অবশ্যই যরূরী, যাতে এই হেদায়াত প্রাপ্ত দলটির সাথে অন্যান্য ভ্রান্ত দলগুলির পার্থক্য করা সম্ভব হয়। যারা দ্বীন বুঝবার ক্ষেত্রে ছাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত নীতি পরিত্যাগ করে চরমপন্থী খারেজীদের অথবা অতিরঞ্জিত ব্যাখ্যাকারীদের অথবা অন্ধবিশ্বাসী মুক্বাল্লিদগণের তরীকা অনুসরণ করেছে।

এতদসত্ত্বেও আমরা নাম নিয়ে কোনরূপ যিদ করি না। বরং আমরা চাই যে, প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী কালেমায়ে শাহাদাতের উপর কায়েম থাকুক এবং এতদুভয়ের চাহিদামতে সাধ্য পক্ষে আমল করুক। যেসব মুসলিম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মহব্বত করে, আমরা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই। আমরা কোন সালাফীকে সাহায্য করি না, যদি সে বাতিলপন্থী হয় এবং যদিও তার প্রতিপক্ষ কাফের হয়। আমরা কোন অন্যায় কর্মে কোন সালাফীকে সমর্থন করি না। বরং আমরা প্রত্যেক মুসলিমকে তার দ্বীন, আক্বীদা ও ঈমান অনুযায়ী মহব্বত করে থাকি। মোটকথা আমরা 'সালাফী দাওয়াতে'র ধারক ও বাহক। ইসলাম বুঝা ও তার উপর আমলের পূর্ণাঙ্গ তরীকা এই দাওয়াতের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। যুগ যুগ ধরে সালাফী বিদ্বানগণ এই দাওয়াতের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে গিয়েছেন, আজও করে চলেছেন।

অতঃপর কে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) প্রণীত 'ফিক্বহের মূলনীতি' সংক্রান্ত কিতাব থেকে? যা তিনি লিখেছেন তাঁর 'কিতাবুর রিসালাহ' (كتاب الرسالة)-এর মধ্যে?[৪] কে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে খারেজীদের

---

৪. ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদ্রীস শাফেঈ (১৫০-২০৪ হি./৭৬৭-৮২০ খৃ.), কিতাবুর রিসালাহ, তাহকীক : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের (১৩৫৮ হি./১৯৩৯ খৃ.) বৈরূত ছাপা, দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, তাবি)। যা ১৮২১টি ক্রমিকে তাহকীকসহ ৫৯৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এবং সর্বসাকুল্যে ৭২৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। উক্ত কিতাবের প্রধান আলোচ্য বিষয় সমূহ হ'ল (১) ইজতিহাদ ও তাক্বলীদ; তাক্বলীদের নিন্দা (২) ইজমা ও ক্বিয়াস, যখন কুরআন ও হাদীছ পাওয়া যাবে না। যেমন তায়াম্মুম জায়েয, যখন পানি পাওয়া যায় না। (৩) 'ইস্তিহসান' বাতিল হওয়া বিষয়ে। (৪) উলুল আমর। এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে যে, ইমাম একজন, কাযী একজন ও আমীর একজন হবেন। (৫) অতিরিক্ত ও বাকীতে বেশী নেওয়ায় সূদ (৬) দণ্ডবিধি সমূহ (৭) সুন্নাহ বিরোধী কোন কথা দলীল নয় (৮) হাদীছ ছহীহ হওয়ার শর্তাবলী এবং প্রমাণিত খবরে ওয়াহেদ দলীল হওয়া বিষয়ে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ব্যবহারিক বিষয় সমূহ।

সম্পর্কে আলী (রাঃ) ও ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বিতর্ক[৫] এবং তার মাধ্যমে মুসলমানদের সম্মান ও সম্পদ হালাল করা হ'তে তাদেরকে বিরত রাখার ব্যাপারে? কে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে ইমাম মালেক (রহঃ)-এর ফিক্বহ থেকে এবং ধর্মদ্রোহী যিন্দীক্বদের সন্দেহবাদ সমূহের বিরুদ্ধে ইমাম আহমাদ (রহঃ) ও ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর কিতাব সমূহ থেকে? যেসব ছিল শারঈ কল্যাণ সমূহের বিষয়ে এবং ভ্রান্ত ফিরক্বা সমূহের প্রতিবাদে লিখিত। এগুলি এবং এতদ্ব্যতীত অন্যান্যগুলি যা সালাফী তরীকার ভিত্তিসমূহ তৈরী করে। আধুনিক যুগের কোন শিক্ষার্থীর জন্য এসব থেকে দূরে থাকার কোন উপায় নেই। তবে এসব কিছুই বাড়তি জ্ঞান লাভের জন্য। বরং সব কিছুর পূর্বে আমাদেরকে কিতাব ও সুন্নাহ্র দলীলসমূহের শরণাপন্ন হ'তে হবে। এটাই হ'ল সালাফী তরীকা। যার সবটুকুই কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকিত দলীল সমূহের অনুসরণ এবং ঐ সকল বিদ্বানগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, যারা এই দ্বীনকে বুঝানো ও তার প্রচারের জন্য দণ্ডায়মান ছিলেন তাদের পদাংক অনুসরণ মাত্র।

মজার ব্যাপার এই যে, যারা 'সালাফী' নামটাকে সহ্য করতে পারেন না, তারা কিন্তু নিজেরা নিজেদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আলাদা নাম নির্বাচন করে নিয়েছেন। নিজেরা যে দোষে দোষী, অন্যকে সেই কারণেই তারা অপরাধী বলছেন। এগুলি স্রেফ প্রবৃত্তির অনুসরণ মাত্র।

তবে আমাদের সঙ্গে অন্যদের পার্থক্য এই যে, আমরা এই নামের প্রতি কোনরূপ যিদ পোষণ করি না, এ নামকে আমরা রক্ষাকবচ মনে করি না এবং এই নামকে আমরা ইসলামের প্রতীক বা প্রতিরূপ হিসাবে ভাবি না। বরং প্রথমে ও শেষে আমাদের একমাত্র পরিচয় আমরা 'মুসলিম' ইনশাআল্লাহ। এই নামেই আল্লাহ আমাদের নামকরণ করেছেন। আমরা ইসলামকে দ্বীন হিসাবে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছি। 'সালাফী দাওয়াত' বলতে আমরা সঠিক ইসলামের চাইতে বেশী কিছু বুঝি না, যা কুরআন ও সুন্নাহ্র যথার্থ প্রতিরূপ এবং যা সালাফে ছালেহীনের প্রকৃত অনুসারী।

---

৫. ইবনু আব্দিল বার্র, জামে'উ বায়ানিল 'ইলমি ওয়া ফাযলিহী (বৈরূত : তাবি) ২/১০৪ হা/১৮৩৪; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৭/২৯০-৯২ 'খারেজীদের উত্থান' অনুচ্ছেদ।

২য় সংশয় : তাদের কেউ কেউ বলেন, আপনারাও তো 'মুক্বাল্লিদ'। এটি অপবাদ মাত্র। কেননা আমরা মোটেই মুক্বাল্লিদ নই। বরং একজন খাঁটি সালাফী অবশ্যই হক ও দলীলের অনুসারী। উম্মতের বিদ্বানগণের প্রতি তারা সম্মান প্রদর্শনকারী। তাদের প্রচেষ্টা সমূহের মূল্যায়নকারী, তাদের ফিক্বহ ও বিদ্যাবত্তা সম্পর্কে বাড়াবাড়ি না করে। কোনরূপ তিরষ্কারকারী, লা'নতকারী, নির্লজ্জ বক্তব্য দানকারী ও বেহুদা বাক্যবাগীশ না হয়ে নিরপেক্ষভাবে তারা হকের অনুসারী হন, যেখানেই তা পাওয়া যাক না কেন।

প্রকৃত সালাফীর পক্ষে একজন 'ইঁচড়ে পাকা' ব্যক্তি হওয়াও সম্ভবপর নয় যে, দু'চার পাতা কুরআন-হাদীছ পাঠ করেই নিজেকে উম্মতের সেরা বিদ্বানদের সমতুল্য মনে করবে। যাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে। অতঃপর সে বলবে উদাহরণ স্বরূপ : আমিও তো মালেক ও শাফেঈ (রহঃ)-এর মত। কিংবা আমিও তেমন বুঝি, যেমন বুঝতেন আহমাদ বিন হাম্বল ও আবু হানীফা (রহঃ)। বরং খাঁটি সালাফী নিজেকে যথাস্থানেই গণ্য করেন এবং পূর্ববর্তী উম্মত ও বিদ্বানগণের যথার্থ মর্যাদা দান করেন। তারা হকের অনুসরণের ভিত্তিতে তাদেরকে যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকেন। যখন তাঁদের কোন কথা দলীলের বিপরীত দেখেন, তখন দলীল না বুঝার কারণে প্রথমে নিজেকে ধিক্কার দেন। অতঃপর তাঁদের ইজতিহাদের পক্ষে ওযর পেশ করে বলেন, হয়তবা তাঁদের নিকট দলীলটি পৌঁছেনি, অথবা উক্ত দলীলের মর্ম তিনি যা বুঝেছেন, আমরা হয়ত তা বুঝিনি। 'রাফ'উল মালাম 'আনিল আয়েম্মাতিল আ'লাম' ('বরেণ্য বিদ্বানগণের উপর থেকে নিন্দা দূরীকরণ') নামক গ্রন্থে ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন।

আমি স্বচক্ষে এমন ছেলেদের দেখেছি, যাদের বয়স এখনও সতের বছর পার হয়নি, যারা ইলমের সামান্য কিছু শিখেছে। যখন তাদের কাছে কোন ইমামের ইজতিহাদ সংক্রান্ত আলোচনা আসে, তখন তারা বলে, 'আমরাও মানুষ তারাও মানুষ'। আশ্চর্য! তুমি বিদ্যার ক্ষেত্রে কতটুকু ওযনের মানুষ যে তাদের সঙ্গে নিজেকে সমান জ্ঞান করলে? বরং এটাই বলা উচিত যে, 'আমি যা বুঝি তা এই' অথবা 'এটাই আমার বিদ্যার দৌড়। এর বেশী বুঝবার ক্ষমতা আল্লাহ আমাকে দান করেননি'।

সংক্ষেপ কথা হ'ল, সালাফীগণ অন্ধ অনুসারী মুক্বাল্লিদ নয়, বরং অনুসারী মুত্তাব্বী। বিদ্বানগণের মর্যাদা দানের ক্ষেত্রে তারা দোষ বর্ণনায়, তিরষ্কার করায় ও গালি প্রদানে বে-শরম বা অতিরঞ্জনকারী নয়। তারা সর্বদা আল্লাহ্র নিকট এই প্রার্থনাই করে, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ও পূর্ববর্তী ঈমানদার ভাইদের ক্ষমা কর। আমাদের অন্তরে ঈমানদারগণের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ রেখ না। হে প্রভু! তুমি বড়ই স্নেহপরায়ণ ও দয়াশীল' *(হাশর ৫৯/১০)*।

এমনিভাবে সালাফীগণ বিভিন্ন ইখতেলাফী বিষয়কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর কালামের নিকট সোপর্দ করেন এবং তার সঠিক মর্ম অনুধাবনের জন্য উম্মতের নেতৃস্থানীয় বিদ্বানবর্গ, ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম ও ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুগামীদের মতামত বিশ্লেষণ করেন (কোন একজন নির্দিষ্ট বিদ্বানের অন্ধ তাক্বলীদ করেন না)। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কালাম বুঝার জন্য এসব বিদ্বানগণের মতামত থেকে হেদায়াত গ্রহণ করা দোষের কিছু নয়। কেননা প্রথমতঃ আমরা কেউই 'অহী' নাযিলের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিনি। দ্বিতীয়তঃ ছাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ ও রাসূলের কালামের মর্মার্থ অনুধাবনে আমাদের সবার চাইতে বেশী জ্ঞানী। এমনিভাবে উম্মতের নেতৃস্থানীয় বিদ্বানবর্গ, যাদের শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে, তারা ছিলেন আমাদের চাইতে অনেক বেশী বুঝের অধিকারী ও বেশী জ্ঞানী। যারা দীর্ঘদিন ধরে পূর্ণ খুলূছিয়াতের সঙ্গে ইলম ও আমলের ময়দানে বিচরণ করেছেন। এক্ষণে যদি কোন শিশু বা কিশোর, যারা এখনো কুরআন ভাল করে পড়তে শিখেনি, জার-মাজরূর, ফেল-ফা'এল বুঝেনি, তারা যদি নিজেদেরকে উম্মতের সেরা বিদ্বানগণের ও মুসলমানদের নেতৃবৃন্দের সমান মনে করে, তবে সেটি হ'ল একটি স্পষ্ট ভ্রান্তি।

আমি নিজে কিছু ছেলেকে দেখেছি, যারা নিজেদেরকে বড় আলেম ভেবে কিভাবে পবিত্র কুরআনও সুন্নাহ্র সঙ্গে খেল-তামাশা করছে। তারা হালাল-হারাম, দাওয়াত, রাজনীতি, ইবাদত ও অন্যান্য ব্যবহারিক বিষয়ে এমন খাম-খেয়ালী আচরণ করে থাকে, যাতে বিজ্ঞানময় ইসলাম কিছু পাগল, আহমক ও উদাসীনদের দ্বীনের পর্যায়ে পড়ে যায়। এর চাইতে বড় বেওকূফী আর কি হ'তে পারে যে, দ্বীনের তাবলীগ ও কুরআন-সুন্নাহ হ'তে হুকুম বের করার

দায়িত্ব নিবে ঐ ব্যক্তি, যে আরবী সাহিত্যে কোনরূপ দখল রাখে না। যে উছূলে ফিক্বহ ও তার নিয়ম-কানূন কিছুই বুঝে না। মোটকথা সালাফীগণ মুক্বাল্লিদ নয় বা তারা অহংকারী বে-শরম নয়। তারা ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম, ওলামায়ে দ্বীন ও উম্মতের নেতৃস্থানীয় বিদ্বানগণের চাইতে অধিক বুঝবার ধারণাও পোষণ করেন না। যারা বিগত যুগ থেকে আজ পর্যন্ত পূর্ণ ইখলাছের সঙ্গে দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে ব্যাপৃত আছেন। বরং প্রকৃত সালাফী তিনিই, যিনি কিতাব ও সুন্নাহ্র অনুসারী, দলীল ও সত্যের সন্ধানকারী এবং বিদ্বানগণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনকারী। তাঁদের দোষ-ত্রুটি সন্ধানকারী নয়। যা থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরে কেউ মুক্ত নন। যারা যাবতীয় বিচ্ছিন্নতা ও স্থায়ী শত্রুতাপূর্ণ ঝগড়ার বিপরীতে মুসলমানদের জামা'আতকে ধারণকারী, তারাই হ'ল প্রকৃত সালাফী। আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আমাদেরকে তাদের মত করুন!

এটি সংযোজন। এই বরকতময় বইয়ের ভূমিকায় এটুকু যোগ করা ব্যতীত কোন উপায় ছিল না। অত্র বইটি দ্বিতীয়বার দেখবার সুযোগ আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন। আমি এর কিছু কিছু বক্তব্য সংশোধন করেছি এবং শেষ অংশে সালাফী দাওয়াতের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ও তার বরকত সমূহের আলোচনা নতুনভাবে যোগ করেছি। আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন একে আমাদের নেকীসমূহের পাল্লায় লিখে নেন এবং মুসলিম উম্মাহকে একই তাওহীদের কালেমার উপর ঐক্যবদ্ধ করে দেন। তিনি যেন আমাদের হাতগুলিকে ইসলামের সম্মান রক্ষা ও সাহায্যের জন্য কবুল করে নেন। আল্লাহ সকল কর্মের উপরে বিজয়ী। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

ইতি
আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক
কুয়েত : জুম'আ
২৬শে মুহাররম ১৪০৩ হি.
১২ই নভেম্বর ১৯৮২ খৃ.।

প্রথম অধ্যায় (الباب الأول)

সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি সমূহ

(الأصول العلمية للدعوة السلفية)

১ম মূলনীতি : তাওহীদ (أولاً : التوحيد)

সালাফী দাওয়াতের প্রথম মূলনীতি হ'ল তাওহীদ। তাওহীদের অর্থ যা সাধারণতঃ লোকেরা ধারণা করে থাকে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সৃষ্টিকর্তা নেই, তা নয়। বরং সালাফীদের নিকট তাওহীদের অর্থ আরও ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী। অধিকাংশ লোক তা না জানার ফলে শিরকের মহাপাতকে লিপ্ত হয়। অথচ নিজেকে খাঁটি তাওহীদবাদী মুমিন হিসাবে ধারণা করে।

সালাফী আক্বীদা মতে তাওহীদের মূলনীতি সমূহ নিম্নরূপ :

প্রথমতঃ তাওহীদে আসমা ও ছিফাত তথা কোনরূপ পরিবর্তন ও দূরতম ব্যাখ্যা ছাড়াই আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর একত্বের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যেমনটি তাঁর উপযোগী।

আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন স্বীয় কালামে পাকের বহু আয়াতে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছহীহ হাদীছ সমূহে আল্লাহ্র বিভিন্ন গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। যা হাদীছের কিতাবসমূহে সংকলিত আছে। যেমন বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ ও অন্যান্য কিতাবসমূহে। যা রিজালশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত। আর আল্লাহ এগুলির বিষয়ে আমাদের খবর দিয়েছেন কেবল সেগুলিকে আমাদের সত্য হিসাবে জানার জন্য ও সেগুলিতে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য। বরং আল্লাহ্র গুণাবলীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ইবাদত ও ঈমানের সবচেয়ে বড় দাবী। যেমন হাদীছে এসেছে যে, সূরা ইখলাছ কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান। অথচ তাতে আল্লাহ্র গুণাবলী ব্যতীত কিছু নেই। কিন্তু তথাকথিত ব্যাখ্যাকারীরা এ ধরনের আয়াত সমূহের নূর মুসলিমদের থেকে দূরে রাখার জন্য বলেছেন যে, 'এগুলি হ'ল আয়াতে মুতাশাবিহাহ। এসবের অর্থ অস্পষ্ট যা আমরা তালাশ করব না বরং যেমনি এসেছে তেমনিভাবে ঈমান আনব। তারা অর্থ করেছেন, কোন মুমিনের জন্য

এর মর্ম বুঝা সিদ্ধ নয়। ফলে তাদের মতে ক্বিয়ামতের দিন 'তোমার রব ও ফেরেশতা মণ্ডলী আসবেন সারিবদ্ধভাবে' আয়াতের অর্থ হবে, আলিফ-লাম-মীম (أٓلمٓ), কাফ-হা-ইয়া-'আইন-ছোয়াদ (كٓهيعٓصٓ)–এর মত (যেসবের সঠিক অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

এভাবে আল্লাহ্র গুণাবলী সংক্রান্ত আয়াতগুলি তাদের নিকট অস্পষ্ট। এর মাধ্যমে তারা এইসব আয়াতের নূর মুমিনদের অন্তরে প্রতিফলিত হওয়া থেকে প্রতিরোধ করেছেন এবং আল্লাহ্র উপযোগী বড়ত্ব মুসলিমদের অন্তরসমূহ ভয়ে কেঁপে ওঠা থেকে বিরত রেখেছেন। এভাবেই তারা তাওহীদকে তার সর্ববৃহৎ ভূমিকা থেকে খালি করেছেন। আর তা হ'ল মহান আল্লাহ্র গুণাবলীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। বস্তুতঃ আল্লাহ্র গুণাবলীর জ্যোতি এবং তার উপাস্যের ও অভিভাবকের পরিচিতির ঔজ্জ্বল্য দ্বারা অন্তর পরিপূর্ণ করা ব্যতীত সেটা ঈমান হয় কি? এতদসত্ত্বেও তারা ধারণা করেন- তাদের ধারণা ব্যর্থ হৌক- এই বেওকূফী ঈমান হ'ল সালাফে ছালেহীনের ঈমান। অথচ তাঁরা এসব থেকে ছিলেন কত দূরে! বরং তারা আল্লাহ্র গুণাবলীর আয়াত সমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন তার মর্ম অনুযায়ী, যা নিয়ে তা আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছিল। আর তা এই যে, আল্লাহ্র ক্ষমতা ও বড়ত্ব অতীব উচ্চ। যার পরিমাপ করা কারু পক্ষে সম্ভব নয়, তিনি ব্যতীত। যিনি পবিত্র ও মহান।

অতঃপর ঐসব তাবীলকারীরা আল্লাহ্র গুণাবলী বিষয়ক আয়াত সমূহের বিভিন্নভাবে অর্থ করেছেন। যেমন ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র আগমনকে তারা তাঁর 'নির্দেশের আগমন' বলেছেন। এমনিভাবে আরশের উপর তাঁর 'অবস্থান'কে তার উপর তাঁর 'প্রতিপত্তি' অর্থে, তাঁর 'হাত'কে 'কুদরত' অর্থে, তাঁর 'চেহারা'কে তাঁর 'সত্তা' অর্থে গণ্য করেছেন। অবশ্য আরশের উপর কোন সত্তার অবস্থানকে তারা স্বীকার করেন না। বরং তারা বলেন, আরশ বলে কিছু নেই। তাদের মতে 'আরশ' অর্থ 'আল্লাহ্র রাজত্ব'। তারা বলেন যে, পৃথিবীতে বা এর বাইরে 'কোথাও আল্লাহ্র কোন অবস্থানস্থল' নেই। সে কারণে তাদের নিকট কোন মুমিনের জন্য এটা জায়েয নয় যে, সে বলুক, আমার প্রভু আসমানে। তারা এসবকে বিদ'আত মনে করেন। কখনও একে কুফরীও বলেন। যেসব হাদীছে রয়েছে যে, আল্লাহপাক 'প্রতি রাতে নিম্ন আকাশে'

অবতরণ করেন, এ সবের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে তারা ভীষণভাবে গালি-গালাজ করেন। তাদের মতে ঐ সময় আল্লাহ নেমে আসেন না, বরং 'তাঁর রহমত' নেমে আসে। কেননা আল্লাহ নামতেও পারেন না, উঠতেও পারেন না। আরশের উপরে কেউ নেই বরং আরশই নেই। তারা আল্লাহ্র কালামকে অস্বীকার করেন। তাদের ধারণা মতে আল্লাহ যখন কারো সাথে কথা বলতে ইচ্ছা করেন, তখন তার মধ্যে সেই কথার বুঝ সৃষ্টি করে দেন। ফলে 'কালামুল্লাহ' বলতে তাদের নিকট 'ইলহাম' বা প্রক্ষেপণ বুঝায়। এ কারণেই তারা বুখারী শরীফের ঐ সকল হাদীছকে মিথ্যা মনে করেন, যেখানে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন কথা বলবেন এমনভাবে যাতে নিকট ও দূরের সবাই সমভাবে শুনতে পায়। যেমন তিনি বলবেন, أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ 'আমিই একমাত্র বাদশাহ। কোথায় আছো পৃথিবীর রাজা-বাদশাহরা'![৬] আমরা এ বিষয়টি প্রশ্নোত্তর সহ আমাদের তাওহীদের বক্তৃতা সমূহে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

এখানে আমরা কেবল মুসলিমদের ঐ সকল দলের প্রতি ইঙ্গিত করতে চাই, যারা নিজেদেরকে হেদায়াত প্রাপ্ত বলে মনে করেন। অথচ উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলি আল্লাহ্র প্রতি তাদের মিথ্যারোপের স্পষ্ট দলীল। আল্লাহ কর্তৃক হালালকে হারাম গণ্যকারী ব্যক্তির উপর যেখানে আল্লাহ কঠিনভাবে ধমকি দিয়েছেন, সেখানে ঐসব লোকদের প্রতি তিনি কেমন ক্রুদ্ধ হবেন, যারা নিজেদের খেয়াল-খুশীমত আল্লাহ্র গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে এমনকি কুরআনের আয়াত ও ছহীহ হাদীছ সমূহের বিকৃত ব্যাখ্যায় লিপ্ত হয়েছেন ও তার নূর থেকে মানুষকে বঞ্চিত করছেন এবং ঈমানদারগণকে বিভ্রান্ত করছেন?

মোটকথা হ'ল, সালাফীগণ আল্লাহ্র গুণাবলী ও নাম সমূহের উপর ঠিক ঐভাবে ঈমান রাখেন, যেভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) বর্ণনা করেছেন। চাই সেটি হাদীছে 'মুতাওয়াতির'[৭] হৌক বা ছহীহ 'খবরে ওয়াহেদ' হৌক।

৬. বুখারী হা/৪৮১২; মুসলিম হা/২৭৮৭; মিশকাত হা/৫৫২২।

৭. যে সকল হাদীছ অবিরত ধারায় বর্ণিত এবং যে সকল হাদীছের বর্ণনাকারী রাবীর সংখ্যা সকল যুগেই অধিক ছিলেন। পক্ষান্তরে খবরে ওয়াহেদ বলতে ঐ সকল হাদীছকে বুঝায়, যার রাবী সংখ্যা সকল যুগে মাত্র একজন ছিলেন।

কেননা ছহীহ খবরে ওয়াহেদ ইলম ও আমল দু'টিকেই ওয়াজিব করে। ইলম ছাড়া যেমন আমল হয় না, আমল ছাড়াও তেমনি ইলমের কোন মূল্য নেই। বিশেষ করে দ্বীনের ব্যাপারে কোন আমল করা কোন মুসলিমের জন্যই উচিত নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা আল্লাহ্‌র কিতাব অথবা রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়।

আর সেকারণে আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর উপর ঈমান আনার ক্ষেত্রে সালাফীদের সঙ্গে অন্যান্য বহু মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়েছে। যারা নিজেদেরকে তাওহীদপন্থী বলে ধারণা করেন। অথচ তারা তা নন। বরং তারা আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে পরিবর্তন করেছেন এবং মানুষকে তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন ও তার মর্মের উপর দৃঢ় প্রতীতি আনয়ন থেকে বিরত রেখেছেন। অথবা তারা এর অর্থ পরিবর্তন করেছেন এবং ভিন্ন রূপে তার উপর বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন (যা উপরের আলোচনায় পরিষ্কার হয়ে গেছে)।

দ্বিতীয়তঃ ইবাদতের জন্য আল্লাহকে একক গণ্য করা। আমরা যখন একথা বলি, তখন এর দ্বারা কেবল ছালাত, যাকাত, ছওম ও হজ্জ বুঝাই না। বরং 'ইবাদত' অর্থে যা কিছু আসে, সবই বুঝাই। যার প্রধান হ'ল দো'আ। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রার্থনাই হ'ল ইবাদত। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারু নিকটে প্রার্থনা করা চলে না, চাই তিনি রাসূল হৌন বা আল্লাহ্‌র খাঁটি অলী হৌন কিংবা কল্পিত অলী হৌন। দো'আর পরেই আসে সিজদা এবং মহব্বত, সম্মান ও ভয়-ভীতি প্রকাশের বিভিন্ন পদ্ধতি, যবহ, মানত ইত্যাদি। এসব কিছুরই হকদার কেবলমাত্র আল্লাহ। কিন্তু বহু লোক এর সবকিছু অথবা কিছু কিছু গায়রুল্লাহ্‌র জন্য করে থাকে।

হে পাঠক! তোমার জন্য কোন একটি পাকা কবর যিয়ারত করাই যথেষ্ট হবে। তুমি দেখবে সেখানকার সকল চাওয়া-পাওয়া কবরবাসীকে কেন্দ্র করেই ঘটে থাকে। যেমন রোগমুক্তি, শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য, আল্লাহ্‌র নিকট সুফারিশ, সন্তান দান, দুনিয়াবী কল্যাণ ইত্যাদি। মোটকথা দুনিয়া ও আখেরাতের সব ধরনের প্রার্থনা এইসব মৃত ব্যক্তিদের নিকট করা হয়। যা 'শিরকে আকবর' অর্থাৎ সবচেয়ে বড় শিরক। যা মানুষকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। অথচ মুসলিম নামধারী বহু দলের লোক দিব্যি এসব করে যাচ্ছে। তারা

কেবল সেখানে দো'আ করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না। বরং ঐসব কবরবাসীর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কুরবানীও দিচ্ছে। যেমন জাহেলী যুগে কাফেররা তাদের মূর্তিগুলোর নিকটে করতো। তারা কবরের উদ্দেশ্যে মানত করে। এমনকি কা'বাগৃহের ন্যায় ওগুলিকে তাওয়াফ করে, সিজদাও করে। যেভাবে আল্লাহ্‌র জন্য সিজদা করা হয়। অথচ এর চাইতে বড় শিরক আর কিছুই নেই।

এইসব কাজ কেবল মূর্খ ও সাধারণ লোকেরাই করে তা নয়। বরং যারা নিজেদেরকে দ্বীনী ইলমের ধারক মনে করেন এবং এর উপরে বড় বড় ডিগ্রীও লাভ করেছেন, তারাও করে থাকেন। আরও করে থাকেন ঐসব তরীকাপন্থী ছূফীরা, যারা নিজেদেরকে বড় মুত্তাক্বী বলে ধারণা করেন। যারা ইবাদতের বিভিন্ন নতুন নতুন তরীকা আবিষ্কার করেছেন। তুমি তাদের নিকট দ্বীনের সারবস্তু দেখতে পাবে কেবল কবরের সম্মান, তার নির্মাণ, তাতে বাতি দান, মানুষকে সেখানে মোরগ ও খাসি কুরবানীর আহ্বান, কবরের উদ্দেশ্যে নযর-নেয়ায প্রদান, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট প্রার্থনা নিবেদন, কবরের তাওয়াফ করণ ইত্যাদি কাজের মধ্যে। এদের কাছে আল্লাহ একটি ভুলে যাওয়া সত্তা মাত্র। ফলে তারা দো'আ করে না, কোনরূপ আশাও করে না এইসব কবর ও মাযারের মাধ্যমে ব্যতীত। এত সব করার পরেও তারা নিজেদেরকে মুসলিম ধারণা করে। অথচ তারা মুসলিম নয়। তারা মুশরিকদের ন্যায়, যারা গায়রুল্লাহ্‌র ইবাদত করে এবং বলে যে, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى. 'আমরা ওদের ইবাদত এজন্যই করি যে, ওরা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নৈকট্যে পৌঁছে দেবে' *(যুমার ৩৯/৩)*।

মানুষের আক্বীদা-বিশ্বাসকে এই প্রকাশ্য ও জ্বলন্ত শিরকের মহাপাতক হ'তে পবিত্র করাই সালাফী দাওয়াতের প্রধান লক্ষ্য। যে ব্যাপারে কেউ ঝগড়া করতে পারে না মুশরিক ব্যতীত। কেউ অহংকার দেখাতে পারে না সেই জ্ঞানান্ধ ব্যতীত, যার চক্ষু তাওহীদ ও ঈমানের নূর হ'তে অনেক দূরে পড়ে আছে।

তৃতীয়তঃ ঈমান আনা এ ব্যাপারে যে, মানুষের দুনিয়াবী জীবনে প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে বিধান রচনার একমাত্র হকদার হ'লেন আল্লাহ। যেমন আল্লাহ বলেন, وَاللهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ 'আল্লাহ নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশকে

পিছনে নিক্ষেপ করার কেউ নেই' *(রা'দ ১৩/৪১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ 'আল্লাহ ব্যতীত কারু শাসন নেই' *(আন'আম ৬/৫৭; ইউসুফ ১২/৪০)*।

অতএব মানুষের জীবন বিধান বা শরী'আত রচনার একমাত্র হকদার হ'লেন আল্লাহ। সেকারণ হালাল কেবল সেটাই হবে, যেটা আল্লাহ হালাল করেছেন এবং হারামও সেটাই হবে, যেটা আল্লাহ হারাম করেছেন। এমনিভাবে দ্বীন, পদ্ধতি, তরীকা বা রং সেটাই হবে, যেটা আল্লাহ প্রবর্তন করেছেন। পৃথিবীর রাজা-বাদশাহ, শাসকবর্গ ও নেতৃবৃন্দ যেভাবে ইচ্ছামত হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করে চলেছেন, সেটা তাওহীদের সঙ্গে দুশমনী, আল্লাহ্র সঙ্গে শিরক এবং তাঁর নিজস্ব অধিকার ও শাসনের বিরুদ্ধে ঝগড়ার শামিল। আধুনিক যুগে পৃথিবীর অধিকাংশ শাসক ও নেতৃবৃন্দ আল্লাহ্র এই অধিকারের বিরুদ্ধে দুঃসাহস দেখাচ্ছেন এবং দুঃসাহস দেখাচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা ও মহান মালিকের বিরুদ্ধে। অতঃপর তারা হালাল করছেন যা আল্লাহ হারাম করেছেন এবং হারাম করছেন যা আল্লাহ হালাল করছেন। তারা আল্লাহ্র বিধান বাদ দিয়ে নিজেদের ইচ্ছামত বিধান রচনা করেছেন। কখনও তারা ধারণা করছেন যে, আল্লাহ্র বিধান যুগোপযোগী নয়, কখনও ভাবছেন, তা ন্যায়নীতি, সাম্য ও স্বাধীনতার বিরোধী। এছাড়া কেউ ভাবছেন যে, এর ফলে মর্যাদা ও নেতৃত্ব বজায় রাখা যাবে না। ঐসব যালেমদের জন্য ঈমানের সাক্ষ্য দেওয়া বরং ঈমানের বিরুদ্ধে শত্রুতার ও আল্লাহ্র সঙ্গে কুফরীর শামিল। দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, মানব জাতির একটি বিরাট অংশ তাদের নেতাদের ও শাসকদের ঐসব আইন-কানূন মেনে চলছে, যা আল্লাহ্র আইনের বিরোধী। অথচ এদের অনেকেই নিয়মিত ছালাত ও ছওম আদায় করে এবং ধারণা করে যে, সে একজন মুসলিম।

সালাফী দাওয়াত হককে তার স্বস্থানে ফিরিয়ে আনার জন্য, দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে খালেছ করার জন্য এবং মুসলিম জাতিকে এই বৃহত্তম শিরক ও প্রকাশ্য কুফরী হ'তে মুক্তি দেওয়ার জন্য সার্বিক অর্থে একটি 'জিহাদ' (جهاد بكل معاني الجهاد)। যাতে আল্লাহ্র ঝাণ্ডা সমুন্নত হয় এবং

কুফরীর ঝাণ্ডা অবনমিত হয়। আর এটা কখনই মানব সমাজে বাস্তব রূপ লাভ করবে না, যতক্ষণ না হুকুম দানের সকল অধিকার আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত করা হবে। বিধান রচনার সকল অধিকার তাঁকে দেওয়া হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না সকল আইন-কানূন আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী ও যুগের মুসলিম বিদ্বানগণের ইজতিহাদ অনুযায়ী ঢেলে সাজানো হবে। যে ইজতিহাদ হবে কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য এবং আধুনিক সমস্যা সমূহের শরী'আত অনুযায়ী সমাধান দেওয়ার জন্য। বক্তৃতা-বিবৃতি, দাওয়াত-তাবলীগ ও জিহাদের মাধ্যমে এই শিরকের মহাপাতক হ'তে উম্মতকে মুক্ত করা ওয়াজিব। কেননা সালাফী আক্বীদার প্রধান দিকগুলির মধ্যে এটি অন্যতম।

চতুর্থতঃ আমরা এই সালাফী তরীকায় বিশ্বাস করি যে, তাওহীদের উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের কোনটিতেই কোনরূপ ভাগ-বাটোয়ারা বা দরাদরি চলতে পারে না। কেননা বিশুদ্ধ আক্বীদা ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য ওগুলি এক একটি রুকন বা স্তম্ভ।

অতএব যে ব্যক্তি এক আল্লাহতে বিশ্বাসী হবে, তাকে অবশ্যই কিতাব ও সুন্নাতে বর্ণিত আল্লাহ্র গুণাবলীর উপরে ঈমান আনতে হবে। এমনিভাবে নযর-মানত, যবহ-কুরবানী, ভয়-ভীতি, আনুগত্য, তাওয়াক্কুল, শপথ ও সম্মান প্রদর্শন সহ সকল ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁকে একক গণ্য করতে হবে এবং এই একত্বকে ক্ষুণ্নকারী বা বিনষ্টকারী সকল চিন্তা থেকে হৃদয়জগতকে পরিচ্ছন্ন করতে হবে। এমনিভাবে ঈমান ও আমল দুই-ই ওয়াজিব, যাতে আল্লাহ্র কালেমা ও তাঁর বিধান সমূহ মানুষের সার্বিক জীবনে সমুন্নত ও মযবূতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব আল্লাহ্র বিধান ব্যতীত কোন দ্বীন নেই। তিনি ব্যতীত কারু প্রতি আনুগত্য নেই। অথবা যা তার আনুগত্য পোষণ করে। অর্থাৎ আল্লাহ্র অবাধ্যতায় সৃষ্টির প্রতি কোন আনুগত্য নেই।

সালাফী তরীকা উপরোক্ত বিষয়গুলির সামষ্টিক নাম। যা তার অনুসারীদের হৃদয়গুলিকে উপরোক্ত বিষয় সমূহের শিরক হ'তে পবিত্র রাখতে চায়। কেননা আমরা বিশ্বাস করি যে, যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহ্র দিকে আহ্বান করে মারা গেল, সে জান্নাতবাসী নয়। আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর কোন কোন বিকৃত ব্যাখ্যা শিরক ও কুফরীর পর্যায়ে পড়ে, যদিও কিছু সে পর্যায়ে

পৌঁছে না। এমনিভাবে আমরা এও বিশ্বাস করি যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী শাসন করে না, সে কাফের এবং যে ব্যক্তি এ ধারণা করে যে, কোন কোন মানুষের জন্য পার্থিব জীবনের আইন-কানূন রচনার অধিকার রয়েছে, যা আল্লাহ্র বিধান ও অভীষ্ট অনুযায়ী নয়, সে ব্যক্তি গায়রুল্লাহ্র ইবাদত করল এবং প্রকাশ্য শিরক করল। যেমন আল্লাহ বলেন,

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيمًا- (النساء 65)-

'অতএব তোমার পালনকর্তার শপথ! তারা কখনো মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদীয় বিষয়ে তোমাকে ফায়ছালা দানকারী হিসাবে মেনে নিবে। অতঃপর তোমার দেওয়া ফায়ছালার ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোনরূপ দ্বিধা রাখবে না এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নিবে' *(নিসা ৪/৬৫)*।[৮]

উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের উপর সালাফী দাওয়াতের প্রথম মূলনীতিটি দাঁড়িয়ে আছে। যার কোন একটি শর্ত ক্ষুণ্ন হ'লে তাওহীদের মূলনীতিই ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায়। অথচ সালাফী আক্বীদায় প্রবেশাধিকার লাভের জন্য সেটাই হ'ল পূর্বশর্ত। কেননা তাওহীদ বিশ্বাসই হ'ল দ্বীনের প্রধান বিষয়। তা ব্যতীত কোন মুসলিম প্রকৃত মুসলিম পদবাচ্য হ'তে পারে না। উক্ত মূলনীতির অধীনে বহু শাখা-প্রশাখা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে, যার কিছু কিছু আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি।

পূর্ববর্তী বিদ্বানগণ তাদের কিতাব সমূহে যুগে যুগে এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করে গেছেন। আর সালাফী তরীকার পথিক এইসব শাখা-প্রশাখাগুলি শেখাকে সর্বদা তার তাওহীদকে পূর্ণতা দানের জন্য ও তার ঈমানকে দৃঢ় করার জন্য লক্ষ্যবস্তু হিসাবে গণ্য করে থাকেন।

---

৮. এখানে لاَ يُؤْمِنُونَ 'মুমিন হ'তে পারবে না'-এর প্রকৃত অর্থ হ'ল, لاَ يَسْتَكْمِلُوْنَ الْإِيْمَانَ 'তারা পূর্ণ মুমিন হ'তে পারবে না' *(ফাৎহুল বারী হা/২৩৫৯-এর ব্যাখ্যা)*। কারণ দু'জন বদরী ছাহাবীর মধ্যে বিবাদ মীমাংসাকে কেন্দ্র করে উক্ত আয়াত নাযিল হয় *(বুখারী হা/২৩৫৯; মুসলিম হা/২৩৫৭; মিশকাত হা/২৯৯৩)*। ফলে কবীরা গোনাহগার কোন মুসলমান প্রকৃত অর্থে কাফের নয়, বরং ফাসেক ও মহাপাপী।

তাওহীদের উপরোক্ত মূলনীতিগুলির[৯] ব্যাখ্যায় সালাফীদের সঙ্গে অন্যান্য বহু সংস্কারবাদী ইসলামপন্থী দলের পার্থক্য ঘটে গেছে। যারা তাওহীদের উপরোক্ত দিকগুলি গণনায় আনেননি। এজন্যই তো দেখি তাদের অনেকেই ছোট-খাট আমল ও ইখতেলাফী বিষয়গুলি নিয়ে জীবন শেষ করে ফেললেন। অথচ দ্বীনের আসল উদ্দেশ্য ভুলে গেলেন, যা ছিল খালেছ তাওহীদ এবং একমাত্র যার প্রতিষ্ঠার জন্যই ইসলাম এসেছিল। এ ধরনের লোকেরা শিরক বলতে কেবল যীশুপূজা ও মূর্তিপূজা বুঝেন। তবে যেসব বিষয়গুলি আমরা একটু আগে উল্লেখ করে এসেছি, তারা ঐসব বিষয় অস্বীকার করেন না। বরং মুবারকবাদ দেন এবং তার অনুসারী লোকদের সঙ্গে ঐক্যমত প্রকাশ করেন। যদিও তাঁদের কারু কারু কাছ থেকে অস্বীকৃতি এসে থাকে। তবে তা ছোট-খাট বিদ'আতের প্রতি অস্বীকৃতির ন্যায়। তাদের মতে এসব দ্বীনের কোন ক্ষতি করে না। অথচ বাস্তব অবস্থা এই যে, তা হ'ল তাওহীদের মূলনীতি সমূহের অন্যতম এবং যা না থাকলে ঈমান ও ইসলামের মধ্যে ত্রুটি থেকে যায়। যদি কেউ প্রশ্ন করেন, কেন আপনারা তাওহীদকে এককভাবে গুরুত্ব দেন এবং একে সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি সমূহের প্রথম মূলনীতি হিসাবে গণ্য করেন? এর জওয়াব এই পুস্তিকার শেষে السلفية دعوة التوحيد 'সালাফী দাওয়াত হ'ল তাওহীদের দাওয়াত' অনুচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে আসবে ইনশাআল্লাহ।[১০]

২য় মূলনীতি : ইত্তেবা (ثانيًا : الاتباع)

পূর্বে বর্ণিত রুকনগুলিসহ তাওহীদের পূর্ণ পরিচয় জানার পর সালাফী দাওয়াতের দ্বিতীয় মূলনীতি হ'ল ইত্তেবা বা অনুসরণ। সালাফী আক্বীদা মতে প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ওয়াজিব হ'ল অনুসরণের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-

---

৯. তাওহীদের উপরোক্ত তিনটি মূলনীতিকে আরবীতে বলা হয় যথাক্রমে
(১) توحيد الأسماء والصفات (2) توحيد العبادة (3) توحيد الربوبية. অর্থাৎ (১) নাম ও গুণাবলীর একত্ব (২) ইবাদতে একত্ব (৩) প্রতিপালনে একত্ব।

১০. উক্ত শিরোনামে কোন আলোচনা বইতে নেই। তবে ৩য় অধ্যায়ে 'সালাফী দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য সমূহ' নামে সর্বশেষ আলোচনা আছে।

কে একক হিসাবে মান্য করা। আর এটি হ'ল কালেমায়ে শাহাদাতের দ্বিতীয় অংশের দাবী। আর তা কখনোই পূর্ণ হ'তে পারে না নিম্নোক্ত বিষয়গুলি ব্যতীত।-

(১) একথা জানা যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় মহান প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে বান্দাদের প্রতি একজন মুবাল্লিগ বা প্রচারক ছিলেন। তিনি দু'টি 'অহী' নিয়ে এসেছিলেন। একটি আল্লাহ্র কিতাব বা কুরআন। দ্বিতীয়টি তাঁর সুন্নাহ। যেমন তিনি এরশাদ করেন, أَلاَ إِنِّى أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَه 'জেনে রেখ, আমি কুরআন ও তার মতই আর একটি বস্তু প্রাপ্ত হয়েছি'।[১১]

অতএব আল্লাহ্র কালামের মতই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কালাম (হাদীছ) আক্বীদা, আমল ও গ্রহণের ক্ষেত্রে সমান। কেননা এটি এবং ওটি দু'টিই মহা পবিত্র আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে প্রত্যাদিষ্ট। দ্বীনের ব্যাপার সমূহে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের পক্ষ থেকে কোন আদেশ-নিষেধ বা হারাম-হালাল করেননি। বরং আল্লাহ্র নির্দেশ মতেই করেছেন। আর তিনি গায়েবের কোন খবর দেননি আল্লাহ্র অহি ছাড়া। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ- لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ- ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ-

'আর যদি সে (জিব্রীল বা মুহাম্মাদ) আমাদের নামে কোন কথা রচনা করত', 'তাহ'লে অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাত দিয়ে ধরে ফেলতাম'। 'অতঃপর তার গর্দানের রগ কেটে দিতাম' *(হা-ক্বাহ ৬৯/৪৪-৪৬)*।

আর যখন সুন্নাহ্র বিষয়টি এমন, তখন তার মধ্যে শামিল রয়েছে শরী'আতের ওয়াজিব, মুস্তাহাব, হারাম, মাকরূহ, মুবাহ সব রকমের ব্যবহারিক বিষয় সমূহ। অতএব যে ব্যক্তি কোন প্রমাণিত বিশুদ্ধ হাদীছের বিরোধিতা করল, সে যেন সরাসরি কুরআনের বিরোধিতা করল।

(২) দ্বীন হ'ল- একটি পদ্ধতি, একটি তরীকা ও একটি ব্যাপক (সামাজিক) রঙের নাম। কেবল আল্লাহ্র সঙ্গে বান্দার একান্ত সম্পর্ক মাত্র নয়। এর অর্থ

---

১১. আবুদাঊদ হা/৪৬০৪; আহমাদ হা/১৭২১৩; মিশকাত হা/১৬৩ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।

হ'ল, আল্লাহ্র হুকুম অনুযায়ী তাঁর রাসূল (ছাঃ) হ'লেন মানুষের সার্বিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের বিধানদাতা। অতএব ব্যবসা-বাণিজ্য, বিবাহ-তালাক, শাসন ও রাজনীতি এবং দণ্ডবিধি সমূহ প্রভৃতি বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছকে অমান্য করা ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ প্রভৃতিকে অমান্য করার ন্যায় গুনাহের কাজ।

(৩) পূর্বোক্ত দু'টি বিষয়ের আলোচনায় রাসূল (ছাঃ)-এর মর্যাদা এমন এক স্তরে উন্নীত হয়েছে, যার নিকটবর্তী হওয়া কোন মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। সেকারণ তার বিরোধিতায় দুনিয়ার কারু কোন কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। চাই তিনি ইমাম, ফক্বীহ, নেতা, রাজনীতিক, চিন্তাবিদ, সমাজ সংস্কারক যিনিই হৌন না কেন। যে ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর কথার পরেও অন্য কারু কোন কথা পেশ করল, সে ব্যক্তি মন্দ কাজ করল, সীমালংঘন করল ও যুলুম করল। সে ব্যক্তি কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মতের বিরোধিতা করল।

(৪) ইত্তেবা বা অনুসরণ কখনোই পূর্ণাঙ্গ হবে না রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি পূর্ণ ভালোবাসা ব্যতীত। যেমন তিনি এরশাদ করেন, لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ. 'তোমাদের কেউ অতক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হ'তে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকট অধিক প্রিয় হব তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষের চাইতে'।[১২]

---

১২. বুখারী হা/১৫; মুসলিম হা/৪৪; মিশকাত হা/৭ আনাস (রাঃ) হ'তে। মাননীয় লেখক এখানে أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ 'আমি তার নিকট তার নিজের জীবনের চাইতে প্রিয় হব' লিখেছেন। তবে সেটি উপরোক্ত হাদীছে নয়, বরং আব্দুল্লাহ বিন হিশাম (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত অন্য হাদীছে এসেছে *(আহমাদ হা/১৮০৭৬)*। আব্দুল্লাহ বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। এ সময় তিনি ওমরের হাত ধরা অবস্থায় ছিলেন। তখন ওমর তাঁকে বললেন, يَا رَسُولَ اللهِ لأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ مِنْ نَفْسِى. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم : لاَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : فَإِنَّهُ الآنَ وَاللهِ لأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِى. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم : الآنَ يَا عُمَرُ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! অবশ্যই আপনি আমার নিকট সবকিছুর চাইতে প্রিয় আমার নিজের জীবন ব্যতীত। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, যতক্ষণ না

আর এই ভালবাসার পরিচয় মিলবে সর্বদা তার নির্দেশ মেনে চলার মধ্যে, তাঁর আনুগত্যের প্রতি দ্রুততা প্রদর্শনের মধ্যে, সকলের কথার আগে তাঁর কথাকে অগ্রাধিকার দানের মধ্যে, তাঁর অবস্থানস্থল ও যুদ্ধস্থল সমূহ এবং তাঁর সুন্নাত ও জীবন চরিত আলোচনা-পর্যালোচনার মধ্যে। তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম বর্ষিত হৌক!

আফসোসের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, বর্তমান যুগে মুসলিমদের মধ্যে এই ইত্তেবা বা অনুসরণের দিকটি দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ভালবাসার অনুভূতি প্রশমিত হয়ে গেছে। নিম্নোক্ত কারণগুলি এর জন্য দায়ী।-

১. তাক্বলীদকে জায়েয গণ্য করা (القول بجواز التقليد) :

প্রশাখাগত বিষয় সমূহে বিভিন্ন ফিক্বহী মাযহাবের জন্য পৃথক ফিক্বহী মাসআলা সমূহ সংকলন করা এবং তা ছহীহ হাদীছের বিরোধী হৌক বা অনুকূলে হৌক, সে গুলির উপর আমল করে যাওয়ার জন্য ফৎওয়া দেওয়া। সাথে সাথে এ কথা বলা যে, এর মধ্যে যা কিছু আছে সবই সঠিক। যদিও সেগুলি মতভেদে পূর্ণ এবং পরস্পরে বিরোধী।

এর ফলশ্রুতি হিসাবে মানুষের মধ্যে ফিক্বহী মাসআলা সমূহের প্রতি একটা জড়তা সৃষ্টি হয় এবং কুরআন ও সুন্নাহর দলীল অন্বেষণ থেকে লোকেরা বিরত থাকে। আর একারণেই কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ইলম ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে।

২. ইলম ও দলীল ছাড়া ফৎওয়া দেওয়া (الإفتاء بغير علم ودليل) :

'যেকোন মাযহাবের ফিক্বহী সিদ্ধান্ত সঠিক' এরূপ ফৎওয়া দানের ফলে মুফতীগণ প্রত্যেক ফৎওয়া তলবকারীকে ঐসব ফৎওয়াই দিয়ে থাকেন, যেগুলি তার অনুসৃত ফিক্বহী রায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। বরং তাদের কেউ কেউ প্রত্যেক মাসআলায় প্রত্যেক মাযহাবের সবচেয়ে সহজ বিধানটি সন্ধান

আমি তোমার নিকট তোমার নিজের জীবনের চাইতে প্রিয় হব'। তখন ওমর বললেন, হ্যাঁ এখন, আল্লাহ্র কসম! আপনি আমার নিকট আমার জীবনের চাইতে অধিক প্রিয়। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ, এখন হে ওমর'! *(বুখারী হা/৬৬৩২)*।

করেন। অতঃপর সেটি দিয়ে ফৎওয়া দেন। ফলে শরী'আত অনুযায়ী আমল করার বিষয়টিকে অপদস্থ করার জন্য এটুকুই যথেষ্ট হয়। বরং উক্ত আমল এক প্রকার দূর হয়ে যায়। কারণ প্রত্যেক মাযহাবে এমন কিছু অতীব উদার কথা আছে, কুরআন ও হাদীছে যার বিপরীত এসেছে। এ বইয়ে যা বর্ণনার সুযোগ নেই। কিছু লোক এ ব্যাপারে আরও বেশী উদারতা দেখিয়ে থাকে। তারা যেকোন আলেমের যেকোন কথা অনুযায়ী ফৎওয়া দেয়। দূরের ও নিকটের অনেকেই জানেন যে, আধুনিক বহু সংখ্যক আলেম সূদ, মদ, মহিলাদের পোষাক ও তাদের অধিকার সমূহ এবং ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ বিষয়ে কি সব ফৎওয়া দিয়ে থাকেন। আমরা যদি এসব ও অন্যান্য বিষয়ে বাতিল ফৎওয়া সমূহ একত্রে জমা করি, তাহ'লে ইসলামকে পুরাপুরি ও ব্যাপকভাবে ধ্বংসকারী একাধিক ভলিউম গ্রন্থ রচিত হয়ে যাবে।

(খ) এসব বাতিল ফৎওয়া সমূহ কেবল ব্যবহারিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং আমলের সীমানা অতিক্রম করে তা আক্বীদা ও গায়েবী বিষয় সমূহের মধ্যেও প্রবেশ করেছে। ফলে সেখানেও লোকেরা নানা রকমের রায় ও ধ্যান-ধারণার বশীভূত হয়ে পড়েছে। বহু আলেম আক্বীদা ও গায়েবী বিষয় সমূহে বহু ছহীহ হাদীছ বাদ দিয়েছেন এবং এসব বিষয়ে তারা নিজ নিজ ধারণা-কল্পনা ও ইজতেহাদ মতে কথা বলেছেন, যেসব বিষয়ে কোন ইজতেহাদ চলে না। তারা স্ব স্ব যুগের অমুসলিম চিন্তাবিদদের রায় সমূহেরও আশ্রয় নিয়েছেন।

৩. কুরআন ও সুন্নাহ্র পঠন ও পাঠনের পথ রুদ্ধ করা

(توعير طريق دراسة القرآن والسنة)

বিভিন্ন প্রকারের ভয়-ভীতির মাধ্যমে এটা করা হয়। যেমন আমরা অহরহ প্রত্যেক কর্কশভাষীর কাছে শুনছি যে, কুরআন ও সুন্নাহ্র পঠন-পাঠন ও তদনুযায়ী আমলকরণ বিভ্রান্তি বৈ কিছুই নয়।[১৩] আমরা আরও শুনে থাকি যে, কুরআনের আয়াত ও হাদীছ সমূহকে সর্বপ্রথম ইমাম ও ফক্বীহদের কথার

---

১৩. কাযী আহমাদ বিন হাম্বল রচিত تنزيه السنة والقرآن عن أن يكونا من أصول الضلال والكفران বইটি দ্রষ্টব্য।

সম্মুখে পেশ করতে হবে। ভাবখানা এই, যেন মানুষের কথাই আসল দলীল, আল্লাহ ও তার রাসূলের কথা নয়। এ ধরনের ভয়-ভীতি ও আশংকা সৃষ্টি মানুষকে কুরআন ও সুন্নাহ্র বিশুদ্ধ বুঝ হাছিল করার পথ রুদ্ধ করেছে এবং জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে তাদেরকে আল্লাহ্র রাস্তা হ'তে বিরত রেখেছে। এটাকে তারা আল্লাহ্র পথের পথিকদের বাঁকা পথে নিয়ে যাওয়ার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে। এর দ্বারা তারা সরাসরি আল্লাহ্র কিতাবের বিরোধিতা করেছে, যা আমাদেরকে কেবল দলীল অনুসরণের হুকুম দিয়েছে ও সর্বদা চোখ খোলা রাখতে বলেছে। যা আমাদেরকে তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুসরণ ও বিনা দলীলে বাপ-দাদার তরীকা অবলম্বন করা হ'তে নিষেধ করেছে। ঐসব লোকেরা রাসূল (ছাঃ)-এরও বিরোধিতা করেছে, যিনি কেবল হাদীছের তাবলীগের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَحَفِظَهَا فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا– 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির চেহারাকে আনন্দোচ্ছ্বল করবেন, যে ব্যক্তি আমার হাদীছ শুনল। অতঃপর তা মুখস্থ করল এবং যেমনভাবে শুনল ঠিক তেমনভাবে প্রচার করল'।[১৪]

অন্যত্র তিনি বলেন, بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ آيَةً 'একটি আয়াত জানা থাকলেও তা তোমরা আমার পক্ষ হ'তে প্রচার করে দাও'।[১৫]

৪. জীবনের বহু ক্ষেত্র হ'তে শরী'আত অনুযায়ী আমল বন্ধ করা

(إيقاف العمل بالشريعة في كثير من نواحي الحياة)

বর্তমান যুগে যারা ইসলাম কিছুটা বুঝেন, সেই সব মুসলিমের নিকট একথা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্র বাদে আমাদের জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্র হ'তে ইসলামকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন শাসনকার্য, রাজনীতি, দণ্ডবিধি সমূহ, শিক্ষা, সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতি বৈষয়িক ক্ষেত্র সমূহ। এর কতগুলি কারণও আছে। যেমন (১) মুসলিম এলাকা সমূহ কাফেরদের

১৪. মুসনাদে বাযযার হা/৩৪১৬, সনদ হাসান; তিরমিযী হা/২৬৫৭; ইবনু মাজাহ হা/২৩০; মিশকাত হা/২৩০; ছহীহ আত-তারগীব হা/৯১।

১৫. বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮।

হস্তগত হওয়া এবং সেখানে তাদের চিন্তাধারা ও আচরণ সমূহের অনুপ্রবেশ ও তার অন্ধ অনুকরণ করা। এতদ্ব্যতীত আরও একটি কারণ রয়েছে যা আমাদের আলোচনার মুখ্য বিষয়। তা হ'ল (২) ফিক্বহী ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করে দেওয়া। অর্থাৎ ঠিক সেই স্থানে দাঁড়িয়ে থাকা যেখানে ছিলেন ফিক্বহ শাস্ত্রের ইমামগণ বহু যুগ পূর্বে। অথচ এরপরে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে। যেসবের যথার্থ ইসলামী সমাধানের জন্য ফিক্বহী আন্দোলন অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু শরী'আত গবেষণার ক্ষেত্রে এই জড়বদ্ধতা এবং রাজনীতি ইসলামী তরীকা হ'তে বিচ্যুত হওয়ার ফলে মুসলিমদের আন্দোলন বিকল হয়ে পড়ে এবং তাদেরকে দৈনন্দিন জীবনে কিছু গ্রহণ ও কিছু বর্জনের মাঝে দিশেহারা করে ফেলে। অতঃপর স্বাভাবিকভাবেই তাদের উপর জয়লাভ করে সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের ও তার অনুগত মিডিয়া সমূহের শক্তিশালী প্রভাব। আর এসব কিছুর মধ্যেই নমুনা ছিল ইসলামী শরী'আত ও রীতি-নীতিকে মুছে দেওয়ার এবং কালেমায়ে শাহাদাতের দ্বিতীয়াংশের প্রকৃত তাৎপর্যকে বিদায় করে দেওয়ার। যেখানে বলা হয়েছে, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ 'আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল'।

ইসলামকে বুঝা ও তদনুযায়ী আমল করার জন্য সালাফী তরীকা তার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে- জনসাধারণ্যে প্রচলিত এইসব পরিণতিগুলিকে অবদমিত করতে, যা রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ ও জনগণের মধ্যে প্রতিবন্ধক হিসাবে রয়েছে। সেকারণ <u>এই দাওয়াত সর্বদা মানুষকে তাক্বলীদ হারাম করার দিকে আহ্বান করে এবং প্রত্যেক মুসলিমের জন্য এ কথা ওয়াজিব মনে করে যে, সে যেন তার প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাবের জন্য কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দলীল তলব করে। এর দ্বারা যেন কেউ এটা না বুঝেন যে, আমরা প্রত্যেককে মুজতাহিদ হওয়া ওয়াজিব বলছি। তা নয়। বরং আমরা প্রত্যেককে এ কথা বলি যে, তিনি যেন দলীলের অনুসারী হন। তিনি যেন তার প্রতিপালকের কিতাব ও তার নবীর সুন্নাহ থেকে প্রমাণের সন্ধানী হন। আর এর মাধ্যমেই কেবল উম্মতের সকল দল এক হ'তে পারে</u>, কিতাব ও সুন্নাহ্র চর্চা বৃদ্ধি পেতে পারে, ইলমী পরিবেশ উন্নত হ'তে পারে এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃসূলভ

সহানুভূতি বৃদ্ধি পেতে পারে। এ অবস্থায় কেউ মুসলিম উম্মাহকে সহজে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। কেননা প্রত্যেক ফৎওয়া তলবকারীর জন্য তখন কুরআন ও সুন্নাহ্র মানদণ্ড দাঁড় করানো হবে। কেবল এ অবস্থায় মুসলিম উম্মাহ্র নিকট রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মর্যাদা ও তাঁর অনুসরণের গুরুত্ব যথার্থভাবে উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে।

আর এভাবেই কেবল সম্ভব হবে ঐসব লোকদের মুখে লাগাম পরানো, যারা হর-হামেশা বিনা দলীলে ফৎওয়া দিতে অভ্যস্ত। কেননা তখন তারা জানবে যে, লোকেরা উপযুক্ত দলীল-প্রমাণ ছাড়া কিছুই আর গ্রহণ করবে না। ফলে ঐ ব্যক্তি যখন নিজের রায় থেকে কোন কথা বলবে, তখন স্পষ্ট বলে দেবে যে, এটা আমার রায়। এতে ভুল হবার সম্ভাবনা আছে। আর যখন বলবে যে, এটি শরী'আতের হুকুম, তখন জনসাধারণ তার নিকটে আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের বাণী থেকে প্রমাণ চাইবে।

পূর্বের দু'টি কাজের মাধ্যমে (অর্থাৎ তাক্বলীদ হারাম করা ও দলীলের অনুসরণ করা) এবং অন্য বিষয়ের (যেমন দাওয়াত ও সংগঠনের) মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট কুরআন ও হাদীছ চর্চার একটি নতুন ময়দানের আবির্ভাব ঘটবে। উম্মতের মধ্যে নবজীবনের সূত্রপাত হবে। (শারঈ ইলমের) জ্যোতি সর্বত্র বিকশিত হবে। তার সামনে সর্বদা দিগদর্শন স্পষ্ট থাকবে। ফলে যেখানেই সে যাক না কেন বিভ্রান্ত হবে না বা (অন্য আদর্শের) লোকেরা তাকে লাগামহারা পশুর মত পিছে পিছে ঘুরাতে পারবে না, যেটা আল্লাহ চান সেটা ব্যতীত।

যখন আমরা এভাবে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক ফিক্বহকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারব, তখন আমরা বর্তমান নাস্তিক্যবাদী স্রোতকে বন্ধ করে দিতে পারব। মানুষের দৈনন্দিন সমস্যাবলীর জবাবে আমরা অমুক বা অমুকের কথা পেশ না করে সরাসরি আল্লাহ্র বা তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর কথা পেশ করব। যদি তারা তা মনোযোগ সহকারে শোনে, তাহ'লে তারা মুসলিম হবে। আর যদি অস্বীকার করে ও প্রত্যাখ্যান করে, তাহ'লে তারা কাফের হবে। এভাবে রাস্তা সমূহ পরিষ্কার হয়ে যায় এবং বেঁচে থাকেন তিনিই, যিনি দলীল সহ বাঁচেন। আর ধ্বংস হয় সেই, যে দলীল ছাড়া বাঁচতে চায়।

৩য় মূলনীতি : তাযকিয়াহ বা শুদ্ধিতা

(ثالثًا: التزكية)

সালাফী দাওয়াতের তৃতীয় মূলনীতি হ'ল তাযকিয়াহ বা আত্মশুদ্ধি। যেজন্য রাসূল (ছাঃ)-এর আগমন ঘটেছিল। বরং বলা যেতে পারে যে, এটাই হ'ল সকল রিসালাতের মূল লক্ষ্য ও ফলাফল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّيْنَ رَسُوْلاً مِنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلاَلٍ مُبِيْنٍ- (الجمعة 2)-

'তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি নিরক্ষরদের মধ্য হ'তে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। যিনি লোকদের নিকট আল্লাহ্র আয়াত সমূহ পাঠ করে শুনান, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও সুন্নাহ শিক্ষা দেন, যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে ছিল' *(জুম'আ ৬২/২)*।

তিনি আরও বলেন,

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلاَلٍ مُبِيْنٍ-

'বিশ্বাসীদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের নিকট তাদের মধ্য থেকে একজনকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করেন ও তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত (কুরআন ও সুন্নাহ) শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে ছিল' *(আলে ইমরান ৩/১৬৪)*।

উপরোক্ত দু'টি আয়াতে আল্লাহ আমাদের নিকট নবী প্রেরণকে 'অনুগ্রহ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। যে নবীর অন্যতম প্রধান কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহ্র আয়াত সমূহ পাঠ করা। এটা একটি বড় নে'মত। কেননা এর ফলে আমরা আল্লাহ্র কালাম একজন মানুষের মুখ দিয়ে শুনতে পাই। অতঃপর তিনি আল্লাহ্র আয়াত বা অহী দ্বারা এই উম্মতকে পবিত্র করেন। অতঃপর

তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দ্বারা মূর্খতার অন্ধকার হ'তে বের করে আনেন। 'কিতাব' অর্থ কুরআন এবং 'হিকমত' অর্থ মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত সকল প্রকারের উপকারী ইলম। এজন্যেই সুন্নাহকে 'হিকমত' বলা হয়। কিতাবও অনেক সময় 'হিকমত' অর্থে আসে।

এখন প্রশ্ন হ'ল তাযকিয়াহ কি, যা রাসূল (ছাঃ)-এর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব?

'তাযকিয়াহ' অর্থ আত্মার পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা। তাকে যাবতীয় ক্লেদ-কালিমা হ'তে মুক্ত করা। 'নফসে যাকিইয়াহ' (النفس الزكية) অর্থ পবিত্রাত্মা। যাবতীয় রকমের খেয়ানত, হিংসা-বিদ্বেষ, যুলুম ও ঈর্ষার কালিমা হ'তে যে আত্মা পবিত্র থাকে। এই অর্থ আরবদের কথা থেকেই নেয়া হয়েছে। যেমন তারা বলে থাকেন, زكا الزرع اذا نما وأينع 'শস্য দানা কলুষমুক্ত হয়েছে, যখন তা বর্ধিত হয় ও পরিপক্ক হয়'। এমনিভাবে পরিচ্ছন্ন গন্ধকে সুগন্ধি বলা হয়।

পবিত্রতার ক্ষেত্রে আত্মা সমূহের পারস্পরিক পার্থক্য বর্ণনায় মহান আল্লাহ বলেন, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا– 'শপথ মানুষের ও তার বিন্যস্তকরণের' 'অতঃপর তিনি তার মধ্যে দুষ্কৃতির ও সুকৃতির প্রেরণা নিক্ষেপ করেছেন'। 'অবশ্যই সফল হয় সেই ব্যক্তি, যে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে এবং নিরাশ হয় সেই ব্যক্তি, যে তার আত্মাকে কলুষিত করে' *(শাম্‌স ৯১/৭-১০)*।

সূরা শাম্‌স-এর উক্ত আয়াত সমূহে আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, সফলতা নির্ভর করে নফসের পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধিতার উপর। পরপর এগারোটি শপথ করে একথাটি বলা হয়েছে।[১৬] কেবল একটি বিষয় বলার জন্য পরপর এতগুলি কসম খাওয়ার নযীর সমগ্র কুরআন মাজীদে নেই।

এই কথাটিই আল্লাহ অন্যত্র অন্যভাবে বলেন যে, পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধিতার গুণ হাছিল না করা পর্যন্ত কেউই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

১৬. বরং পিছনের ৮টি আয়াতে বর্ণিত আটটি সৃষ্টবস্তুর শপথ করা হয়েছে।

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ-

'যারা তাদের প্রতিপালকের ভয়ে ভীত, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। অতঃপর তারা জান্নাতের দোরগোড়ায় এসে পৌঁছলে দরজা খুলে দেওয়া হবে। তখন জান্নাতের দাররক্ষীরা (ফেরেশতা) বলবে, আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হৌক! আপনারা সুখী হৌন! অতঃপর চিরকালের জন্য এখানে প্রবেশ করুন' *(যুমার ৩৯/৭৩)*।

এখানে পবিত্রতাই তাদের জান্নাতে প্রবেশ লাভের একমাত্র কারণ। এটাই হ'ল ইবাদতের ফল ও উদ্দেশ্য। আর এই আত্মিক পরিশুদ্ধি হাছিলের জন্যেই কেবল রাসূল (ছাঃ)-এর আগমন ঘটেছিল। তাঁর উপর অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষিত হৌক!

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দু'টি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি।-

(১) তাযকিয়ায়ে নাফ্স বা আত্মার পরিশুদ্ধি আনয়ন রাসূল আগমনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বরং একটু পরেই আমরা জানতে পারব যে, এটাই ছিল রাসূল প্রেরণের মূল লক্ষ্য ও সমগ্র মানব অস্তিত্বের একমাত্র উদ্দেশ্য।

(২) জান্নাতে প্রবেশের জন্য ওটাই অপরিহার্য গুণ। যে ব্যক্তি এই গুণে গুণান্বিত নয়, সে ব্যক্তি জান্নাতের অধিকারী নয়।

এক্ষণে আরেকটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, উক্ত উদ্দেশ্য বা তাযকিয়াহ হাছিলের জন্য আল্লাহ বা তাঁর রাসূল আমাদের নিকট কি কি মাধ্যম বিবৃত করেছেন? অন্য কথায় নফস কিভাবে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র হ'তে পারে, এই আবশ্যিক গুণ হাছিলের জন্য আল্লাহ্র নবী কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন?

এ প্রশ্নের জবাব দানের জন্য আমাদেরকে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ শরী'আত সামনে রাখতে হবে এবং তা গভীর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে পরীক্ষা করতে হবে। চাই তা আক্বীদার বিষয় হৌক বা ইবাদতের বিষয় কিংবা ব্যবহারিক বিষয় হৌক। এর প্রত্যেকটির মধ্যে আমরা তাযকিয়াহ বা পরিশুদ্ধির সম্পর্ক দেখতে পাব। গভীরভাবে চিন্তা করলে আমরা দেখব যে, শুদ্ধিতা অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট কোন

আমল নেই। বরং ইসলামের সমস্ত রীতি-পদ্ধতি, আক্বীদা-বিশ্বাস ও আচরণবিধি সব কিছুরই শেষ ফল গিয়ে দাঁড়ায় তাযকিয়াহ বা আত্মার পরিশুদ্ধি।

আমরা সর্বদা একথা জানি যে, 'যাকাত' অর্থ হ'ল পবিত্রতা ও নাপাকী হ'তে দূরে থাকা। অতএব 'তাওহীদ' হ'ল তাযকিয়াহ। কেননা তাওহীদ অর্থ আল্লাহকে প্রতিপালক হিসাবে একক বলে স্বীকার করা। যিনি ব্যতীত কোন প্রতিপালক নেই। আর এই সত্যের স্বীকৃতি ও সাক্ষ্যদান একটি তাযকিয়াহ। কেননা সত্যকে স্বীকার করে নেওয়াটা পুণ্য। আর অস্বীকার করা ও প্রত্যাখ্যান করাটা নিকৃষ্টতা। আর তা কি ধরনের নিকৃষ্টতা? জ্ঞানী ও দূরদর্শী ব্যক্তির নিকট আল্লাহ্র চাইতে বড়, স্পষ্ট ও প্রকাশ্য সত্য আর কিছুই নেই। পক্ষান্তরে আল্লাহকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করা ও তাঁর সাথে শরীক করা হ'ল সবচেয়ে বড় নিকৃষ্টতা ও অপবিত্রতা। আর এ কারণেই আল্লাহ বলেছেন, إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ 'মুশরিকরা নাপাক বৈ কিছুই নয়' *(তওবাহ ৯/২৮)*। এর একমাত্র কারণ হ'ল যে, তাদের অন্তরগুলি শিরক, কুফর এবং আল্লাহ্র গুণাবলীকে অস্বীকার প্রভৃতি দ্বারা কলুষিত। প্রকাশ্যভাবে তাদের অনেকের দেহ পবিত্র থাকতে পারে। কিন্তু যতদিন তাদের অন্তর জগৎ শিরক ও কুফরের নাপাকী দ্বারা পূর্ণ থাকবে, ততদিন তারা আত্মা ও অনুভূতির দিক দিয়ে অপবিত্র থাকবে।

সকল প্রকারের ইবাদত, চাই তা আর্থিক হৌক বা দৈহিক হৌক, সবই তাযকিয়াহ বা পবিত্রতা হাছিলের আমল। কেননা তা হৃদয়ে আল্লাহ্র স্মরণ এনে দেয় এবং তাকে স্রষ্টার সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। আর এভাবেই অন্তরে আল্লাহভীতি সৃষ্টি হয়। অতএব যে ব্যক্তি প্রত্যেকটি কাজে সতর্কতা অবলম্বন করে এবং তার প্রতিপালককে ভয় করে, সে নিষিদ্ধ বস্তু সমূহ হ'তে দূরে থাকে। আর নিষিদ্ধ কর্ম সমূহ নাপাক ও অশুদ্ধ এবং উত্তম কর্ম সমূহ পাক ও বিশুদ্ধ।

এজন্যই 'ছালাত' হ'ল সকল সৎকর্মের সেরা। কেননা ছালাতই তাযকিয়াহ হাছিলের সর্বাপেক্ষা সফল মাধ্যম। যা দিনে ও রাতে বার বার আদায় করা হয়। যার মধ্যে আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। তার প্রতিটি উঠাবসা অন্তরকে

আল্লাহ্র হাকীকত বা প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধিতে সহায়ক হয়। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ 'নিশ্চয়ই ছালাত যাবতীয় নির্লজ্জতা ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে' *(আনকাবূত ২৯/৪৫)*। কেননা এটি উপদেশ লালন করে ও আল্লাহভীরুতা আনয়ন করে।

এ কারণেই আহলে সুন্নাতের ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) ফৎওয়া দিয়েছেন যে, যবরদস্তীভাবে দখলকৃত যমীনের মসজিদে ছালাত বাতিল'। এটি তাঁর অতীব দূরদর্শী জ্ঞানের পরিচায়ক। কেননা তিনি মনে করেন যে, অধিকৃত কোন মাটিতে ছালাত ও দো'আর অনুষ্ঠান ছালাত আদায়কারীর অপবিত্র অন্তঃকরণ ও আল্লাহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার শামিল। এজন্য যে, ঐ ব্যক্তি যদি সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে স্মরণকারী হ'ত, তাহ'লে সে কখনোই অধিকৃত মাটি কামড়ে পড়ে থাকত না। বরং তাকে মুক্ত করে যথার্থ মালিকদের নিকট ফিরিয়ে দিত।[১৭]

যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে একজন মহিলা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হ'ল যে, يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ فُلاَنَةً تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ، وَتَفْعَلُ، وَتَصَدَّقُ، وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا؟ 'যে রাতভর 'ছালাত' ও দিনভর 'ছিয়াম' আদায় করে এবং অন্যান্য নেকীর কাজ করে ও ছাদাক্বা করে, কিন্তু প্রতিবেশীকে যবান দ্বারা কষ্ট দেয়। জবাবে তিনি বলেন, لاَ خَيْرَ فِيهَا، هِيَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ 'এতে তার কোন কল্যাণ নেই। সে জাহান্নামী। প্রশ্নকারী বলল, অমুক মহিলা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে। পনীরের টুকরা দান করে। কিন্তু কাউকে কষ্ট দেয় না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ঐ মহিলা জান্নাতের অধিকারী'।[১৮]

তাৎপর্য অত্যন্ত পরিষ্কার। কেননা যদি ঐ মহিলা সত্যিকার অর্থে 'ছালাত আদায়কারী' বা 'ছিয়াম পালনকারী' হ'ত, তাহ'লে অবশ্যই সে নিজের

---

১৭. উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' (১ম সংস্করণ ১৪২২ হি.) ১০/৬০। তবে এখানে ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর নাম বলা হয়নি।

১৮. ইমাম বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১০৯; ছহীহাহ হা/১৯০; মিশকাত হা/৪৯৯২, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত।

নফসকে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়ার মত নিকৃষ্ট স্বভাব থেকে বিরত রাখত। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যত্র বলেছেন, مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِى أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ 'যে ব্যক্তি ছিয়াম অবস্থায় মিথ্যা কথা ও তার উপর আমল করা ছাড়তে পারল না, আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই যে, সে খানাপিনা ছেড়ে দিক'।[১৯]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ভয়ে খানাপিনা ত্যাগ করল, অথচ সে আল্লাহ্র ভয়ে মিথ্যা কথা ও কাজ পরিত্যাগ করতে পারল না, তার আল্লাহভীতি ও তাক্বওয়ার দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা। সে তার ছিয়াম ও ইবাদতের উদ্দেশ্য পণ্ডকারী মাত্র।

এজন্য আমাদের উচিত হবে না ইসলামের ইবাদত সমূহ এবং সেসবের উদ্দেশ্য ও ফলাফলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা। বরং আল্লাহ সর্বদা আমল ও তার ফলাফলকে এক করে দেখিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ– 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ'ল, যেমন তা ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হ'তে পার' *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*।

অন্যত্র আল্লাহ ইবাদতের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ– 'হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দাসত্ব কর। যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হ'তে পার' *(বাক্বারাহ ২/২১)*।

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, সমস্ত ইবাদতের উদ্দেশ্য হ'ল আল্লাহভীতি অর্জন করা। এখানে আল্লাহ বিষয়টি প্রকাশ করেছেন لَعَلَّ (সম্ভবতঃ) শব্দ দ্বারা। যা

---

১৯. বুখারী হা/১৯০৩; মিশকাত হা/১৯৯৯।

আকাংখার অর্থ দেয়। অথচ আল্লাহ কিছুই আকাংখা করেন না। কেননা তিনি যা চান, তাই-ই করেন। কিন্তু এখানে আশা বা আকাংখা করা বলা হয়েছে বান্দার দিকে উদ্দেশ্য করে। কেননা প্রত্যেক ইবাদতকারী মুত্তাক্বী হয় না। বরং মুনাফিকরা সৎকর্ম ও ইবাদত করে প্রকাশ্যভাবে। কিন্তু তারা তাতে অবিশ্বাসী ও অস্বীকারকারী। এর দ্বারা আমরা এটাও বুঝলাম যে, ইবাদত করা সত্ত্বেও যে ব্যক্তির তাক্বওয়া অর্জিত হ'ল না, সে ব্যক্তি তার ইবাদতে খিয়ানতকারী ও তা বিনষ্টকারী। সুতরাং যথার্থ ইবাদতকারীর পরিচয় হ'ল এই যে, তিনি অবশ্যই পরিশুদ্ধ হবেন, আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হবেন ও সৎকর্মশীল হবেন। আর এটাই হ'ল তাযকিয়াহ বা পবিত্রতা। বরং ইবাদত বিধিবদ্ধ করা হয়েছে আত্মশুদ্ধির জন্য। ইবাদত ব্যতীত কোন ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হ'তে পারে না। কেননা আনুগত্য পবিত্রতা থেকেই আসে। অতঃপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ, করুণা ও নে'মত সমূহ আমাদের উপর ভরপুর। তার আনুগত্য করাই আমাদের সকল সৎকর্ম এবং কৃতজ্ঞতা ও স্বীকৃতির প্রথম সোপান। সে কারণেই শুদ্ধিতা ও পবিত্রতা কল্পনাই করা যায় না আল্লাহ্র হুকুম সমূহের আনুগত্য ও নিষেধসমূহ হ'তে বিরত থাকা ব্যতীত।

পবিত্র কুরআনে বহু স্থানে ইবাদতকে তাক্বওয়ার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ– 'আর হে জ্ঞানীগণ! হত্যার বদলে হত্যার মধ্যে তোমাদের জীবন নিহিত রয়েছে। যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হ'তে পার' *(বাক্বারাহ ২/১৭৯)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ– 'আর এটিই আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এর অনুসরণ কর। অন্য পথ সমূহের অনুসরণ করো না। তাহ'লে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুৎ করে দেবে। এসব বিষয় তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হ'তে পার' *(আন'আম ৬/১৫৩)*।

উপরোক্ত আয়াতগুলির মাধ্যমে তাযকিয়াহ্র তৃতীয় আরেকটি অর্থ আমরা জানতে পারলাম। সেটি হ'ল এই যে, <u>কেবলমাত্র তাযকিয়াহ বা পবিত্রতা বাস্ত</u>

বায়নের জন্যই ইসলামী শরী'আতের সকল বিধি-বিধান রচিত হয়েছে। যেমন তাওহীদ, ইবাদত, ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ, পিতা-মাতার আনুগত্য, আত্মীয়তা রক্ষা, নির্লজ্জ ও অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করা এবং ন্যায়বিচার ও সৎকর্ম নিশ্চিতকারী বিষয় সমূহ সবই এসেছে, কেবলমাত্র এই তাযকিয়াহ বাস্তবায়নের জন্য। এই সমস্ত আদেশ নিষেধাবলীর কোনটি সরাসরি তাযকিয়াহ্র রুকন ও আবশ্যিক বিষয়। আবার কোনটি তাযকিয়াহ হাছিলের সহায়ক।

উপরোক্ত অর্থের উপরে স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে নিম্নের এ আয়াতটি যাতে তোমার মনে কোনরূপ সন্দেহ না থাকে, যেখানে আল্লাহ তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে বলেছেন, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ 'নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত' *(ক্বলম ৬৮/৪)*। বলা বাহুল্য তাঁর চরিত্র কুরআনের উপরে আমলের বাস্তব চিত্র বৈ কিছুই নয়, যা তাযকিয়াহ্র সকল পর্যায়কে শামিল করে। যেমন একদা সা'দ বিন হিশাম আয়েশা (রাঃ)-কে রাসূল (ছাঃ)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাবে বলেন, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ 'তাঁর জীবন চরিত ছিল কুরআন'।[২০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এজন্যই বলেছেন যে, بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاقِ 'আমি সচ্চরিত্রতার পূর্ণতা সাধনের জন্য প্রেরিত হয়েছি'।[২১] রাসূল (ছাঃ)-এর রিসালাতকে এ বিষয়ের উপরে সীমায়িত করা এ কথারই পূর্ণ প্রমাণ বহন করে যে, ইসলামের রিসালাত পুরোপুরিভাবে তাযকিয়াহ ও শুদ্ধিতার রিসালাত।

---

২০. আহমাদ হা/২৫৩৪১; ছহীহুল জামে' হা/৪৮১১। মাননীয় লেখক উক্ত হাদীছটি ছহীহ বুখারীতে আছে বলেছেন। কিন্তু এটি ছহীহ বুখারীতে নেই। বরং মুসনাদে আহমাদে রয়েছে, যা আমরা উল্লেখ করেছি। তবে কিছুটা ভিন্ন মর্মে ছহীহ মুসলিমে একই রাবী হ'তে হাদীছ এসেছে,فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ الْقُرْآنَ 'রাসূল (ছাঃ)-এর চরিত্র ছিল কুরআনের বাস্তব নমুনা' *(মুসলিম হা/৭৪৬; মিশকাত হা/১৫২৭ 'বিতর' অনুচ্ছেদ)*।

২১. হাকেম হা/৪২২১; আমরা উক্ত মর্মে প্রসিদ্ধ হাদীছটিই উল্লেখ করলাম। মাননীয় লেখক إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ صَالِحَ الأَخْلاَقِ 'আমি সচ্চরিত্রতার পূর্ণতা সাধনের জন্য ব্যতীত প্রেরিত হইনি' *(আহমাদ হা/৮৯৩৯; ছহীহাহ হা/৪৫)*।

যখন আমরা জানতে পারলাম যে, ইসলাম পবিত্রতার ধর্ম এবং রাসূল (ছাঃ)-এর আগমন কেবলমাত্র এজন্যই ঘটেছিল, তখন সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একথাও জেনে নেওয়া ওয়াজিব যে, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) উক্ত তাযকিয়াহ হাছিলের যাবতীয় নিয়ম-পদ্ধতি ও আমল পরিপূর্ণ করে গিয়েছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দ্বীন ও নে'মতকে তাঁর রাসূল ও মুমিনদের উপর পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِينًا-

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নে'মতকে সম্পূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' *(মায়েদাহ ৫/৩)*। এর অর্থ হ'ল এই দ্বীনের মধ্যে নতুন কোন তরীকা বা পথ-পন্থার উদ্ভব ঘটানো যাবে না। একই অবস্থা নৈকট্য হাছিলের সকল ক্ষেত্রে। কারণ ইবাদতের ক্ষেত্রে যেকোন নবোদ্ভূত পথ-পন্থা ফাসাদ ও পদস্খলনের দিকে নিয়ে যাবে। বরং তা পরিত্যক্ত হবে এবং তা আল্লাহ্‌র নিকট কবুল হবে না।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, বর্তমান যুগে মুসলিমদের উপর নতুন নতুন তরীকা আবিষ্কারের দুয়ার কিভাবে খুলে গিয়েছে এবং সেখানে কত ধরনের অপকর্ম প্রবেশ করেছে। তাছাউওফের নামে 'ইছলাহে নাফস' বা আত্মশুদ্ধির পদ্ধতিসমূহে ও তার পরিমণ্ডলে কত যে পাপ জমা হয়েছে, তার সীমা-পরিসীমা নেই। তারবিয়াত ও ইবাদতের গণ্ডি পেরিয়ে এই পাপ মিথ্যা হাদীছ তৈরী, আক্বীদা ধ্বংস করা ও শরী'আত দলনের ক্ষেত্র অতিক্রম করেছে। যাকে তারা 'যাহেরী ইলম' বলে থাকে। আর যত বিদ'আত, কল্পকাহিনী ও বাজে অনুষ্ঠানাদির দরজা সেখানে খুলে গিয়েছে ব্যাপকভাবে।

এরপর তারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের ইবাদত তথা শিরকের মহাপাতকে লিপ্ত হয়েছে। (আর এসবের রক্ষাকবচ হিসাবে আবিষ্কার করেছে) ধ্বংসকারী দার্শনিক মতবাদ সমূহ। যেমন অদ্বৈতবাদ, সর্বেশ্বরবাদ প্রভৃতি পারসিক ও হিন্দুয়ানী মতবাদ। অতঃপর তারা আবিষ্কার করেছে 'ক্বাযা ও ক্বদর' তথা তাক্বদীর বিষয়ে এমন এক আত্মবিনাশী মতবাদ, যেখানে সবকিছু আল্লাহ্‌র

ইচ্ছাতেই হয় এবং সেখানে মানুষকে একটি দায়িত্বমুক্ত জড় পদার্থের ন্যায় কল্পনা করা হয়েছে। ফলে আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দা এবং অবাধ্য বান্দার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য থাকে না। বরং সেখানে পাপীরাই সৎলোকদের চাইতে অধিক মর্যাদাবান হয়। আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমাদের কিতাব, الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة (কিতাব ও সুন্নাতের আলোকে ছূফী মতবাদ)-এর মধ্যে।[২২]

উপরোক্ত ছূফী মতবাদের মুকাবিলায় আর একটি ফিক্বহী জড়তা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, যা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দলীল সমূহকে মর্মার্থ বিহীন কতগুলি বাহ্যিক শব্দাবলীর সমাহারে পর্যবসিত করল। বিশেষ করে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বিধানগুলিকে যখন মেশিনের ছাঁচের ন্যায় মানুষের তৈরী বিভিন্ন ফিক্বহী পরিভাষার ছাঁচে ঢেলে দেওয়া হ'ল (যাকে উছূলে ফিক্বহ বলা হয়)। এভাবে কিতাব ও সুন্নাহ্‌র মূল উৎস হ'তে মানুষ দূরে চলে যাওয়ার পর তারা এইসব মনগড়া ছাঁচ বা নিয়ম-বিধিসমূহের উপর এমনভাবে আমল শুরু করল এবং সেগুলির প্রতি এমন ভীতি ও পবিত্রতার অনুভূতি প্রকাশ করতে লাগল, যেমনটি করা আবশ্যক ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কালামের প্রতি।

অতঃপর এইসব ছাঁচকে কৌশল বানিয়ে কাজ করা তাদের জন্য সহজ হয়ে গেল। ফলে এমন বহু বিষয় হালালে পরিণত হ'ল যা বাহ্যিকভাবে শরী'আত সম্মত গণ্য হ'লেও প্রকৃত প্রস্তাবে তা হারাম। যেমন কোন বস্তু প্রকৃত মূল্যের চাইতে বেশী দামে বাকীতে বিক্রি করা, হিল্লা বিবাহ, ব্যবসার বিভিন্ন পদ্ধতিতে সূদ খাওয়া, অলী ও সাক্ষী ছাড়াই কেবল পারস্পরিক সম্প্রদানের ভিত্তিতে যেনা করা প্রভৃতি। এরপর লোকেরা আরও লাগাম ছাড়া হ'ল। তারা তাদের পসন্দমত যেকোন শায়খ ও আলেমের কথাকে দ্বীনের দলীল হিসাবে গ্রহণ করতে শুরু করল। এভাবে নিষেধকারী শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ল।

২২. বইটির ২য় সংস্করণ যেটি ১৯৯৪ সাল থেকে আমাদের কাছে আছে, সেটির পৃষ্ঠা সংখ্যা সর্বসাকুল্যে ৪৭০। প্রকাশক : মাকতাবা ইবনে তায়মিয়াহ, কুয়েত, তাবি। একই মর্মে ৬৪ পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ৫ম সংস্করণ একই প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়েছে ১৪১০ হি./১৯৯০ সালে فضائح الصوفية 'ছূফীদের অপকর্ম সমূহ' নামে। যেটি একই সময় থেকে আমাদের নিকট রয়েছে।

নৈতিকতার স্তম্ভ ধ্বসে পড়ল। তাযকিয়াহ বা আত্মশুদ্ধির পদ্ধতিগুলি বিনষ্ট হ'ল। একমাত্র যে কারণেই ইসলাম এসেছিল।

সালাফী তরীকা উপরোক্ত ছূফী (বাত্বেনী) তরীকা ও ফিক্বহী (যাহেরী) তরীকার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। ফলে তাযকিয়াহ আল্লাহ্র দ্বীনের যথাস্থানে রক্ষিত হয়েছে। একেই সে মুসলিম জীবনের উদ্দেশ্য হিসাবে গণ্য করেছে এবং এর জন্য শরী'আত সম্মত পদ্ধতি সমূহ অনুসরণ করেছে, যা কিতাব ও সুন্নাহতে মওজূদ রয়েছে। ঐ দু'টির বাইরে তাযকিয়াহ নেই এবং ঐ দু'টি ব্যতীত তাযকিয়াহ কখনোই হাছিল হ'তে পারে না। আর সে কারণেই সালাফী তরীকায় ছূফীদের আবিষ্কৃত ইবাদত ও সুলূক সমূহ বাতিল করা হয়েছে। যেমন পরিত্যক্ত স্থান ও কবরস্থান সমূহে নির্জন বাস, নির্দিষ্ট এক ধরনের খাদ্যের উপর বেঁচে থাকা, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লোক সঙ্গ ত্যাগ করা, অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন থাকা, কথাবার্তা না বলা, রৌদ্রে বসে থাকা, শরী'আত বিরোধী নানা কাজের মাধ্যমে নিজেকে কষ্ট দেওয়া, বিভিন্ন বিদ'আতী যিকর-আযকার পাঠ করা, নাচ-গান ও সিমা'[২৩] সহ বিভিন্ন শয়তানী অনুষ্ঠান করা, যেগুলি ছূফী তরীকার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হয়। এমনিভাবে সালাফী তরীকা ঐসব তথাকথিত কাশফ ও ইলহামকে বাতিল ঘোষণা করেছে, যা শয়তানী ধোঁকা কিংবা নাস্তিক্যবাদী দর্শন চিন্তা বৈ কিছুই নয়। আমরা উক্ত বইয়ে এসবের মুখোশ খুলে দিয়েছি। সেখানে তাদের বিস্ময়কর তথ্যসমূহ দেখতে পাবেন।

সালাফী তরীকা ঐসব যাহেরী কট্টর মতবাদীদেরকেও বাতিল গণ্য করেছে, যারা দলীল নিয়ে চলে, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ভুলে যায়। এই বক্র ফিক্বহ যা দ্বীন বিষয়ক সকল কথাকে দলীল সাব্যস্ত করেছে এবং দলীলবিহীন সকল ফৎওয়াকে শারঈ বিধানে পরিণত করেছে। আর এর মাধ্যমে বহু হারাম হালাল হয়ে গেছে। সংস্কার ও সংশোধনের পথ সমূহ বিনষ্ট

---

২৩. উর্দূতে সিমা' (السماع) বলতে ছূফীদের বিশেষ এক ধরনের নাচ-গানকে বুঝায় এবং 'সুলূক' (السلوك) হ'ল আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের নামে তাদের আবিষ্কৃত ক্রিয়া-কর্ম সমূহ।

হয়েছে। লোকদের অন্তরগুলি অন্ধকার হয়ে গেছে এবং সেখানে আসমানী অহি তথা আল্লাহ্র কিতাব ও তার রাসূলের সুন্নাতের জ্যোতি নিভে গেছে।

সালাফী তরীকা হ'ল সংশোধন, প্রশিক্ষণ, আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল ও শুদ্ধিতা অর্জনের জন্য। এখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত সে কাউকে শ্রেষ্ঠতম নমুনা মনে করে না। তিনি মানবজাতির মধ্যে আত্মার দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা পবিত্র, মর্যাদার দিক দিয়ে সর্বোচ্চ, চরিত্রে সুদৃঢ় এবং তরীকা ও পদ্ধতিতে শ্রেষ্ঠতম পথ প্রদর্শক।

যেমন তিনি এরশাদ করেছেন, إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللهِ أَنَا 'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু এবং তার সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞান রাখি আমিই'।[২৪] একারণেই সালাফী তরীকা শুচিতা ও শুদ্ধিতা অর্জনে এবং অনুসরণের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র কালামের পর রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ ও চরিত্র মাধুর্যকেই ভিত্তি হিসাবে গণ্য করে। এমনিভাবে প্রথম যুগের ছাহাবায়ে কেরামের জীবন চরিতকে আমরা পরিশুদ্ধ আত্মাসমূহের নেতা হিসাবে মনে

---

২৪. বুখারী হা/২০; হাদীছটি নিম্নরূপ :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِذَا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ مِنَ الأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ قَالُوا إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ يَقُولُ : إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللهِ أَنَا–

'আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কাউকে কোন কাজের নির্দেশ দিতেন, তখন সেটি তাদের সাধ্যমত করার জন্য বলতেন। তারা বলল, আমরা আপনার মত নই, হে আল্লাহ্র রাসূল! তখন তিনি ক্রুদ্ধ হ'লেন এবং চেহারায় তা প্রকাশ পেল। অতঃপর তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু ও আল্লাহ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী আমি'। একই মর্মে আনাস (রাঃ) থেকে বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদীছটি এসেছে, যেখানে তিনজন যুবকের উপরোক্ত মর্মে কথোপকথনের জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, أَمَا وَاللهِ إِنِّى لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّى أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّى وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى– 'অতঃপর আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু ও সর্বাধিক অন্যায় থেকে পরহেযগার। কিন্তু আমি ছিয়াম রাখি আবার ছেড়েও দেই। ছালাত পড়ি, নিদ্রাও যাই এবং আমি বিবাহ করেছি। অতএব যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত হ'তে মুখ ফিরিয়ে নিবে, সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়' *(বুখারী হা/৫০৬৩; মুসলিম হা/১৪০১; মিশকাত হা/১৪৫ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*।

করি। যাঁরা ছিলেন কথায়, কাজে ও চরিত্রে কুরআন ও সুন্নাহ্র বাস্তব নমুনা এবং আত্মার পরিশুদ্ধিতা ও পবিত্রতার জীবন্ত প্রতীক। পরবর্তী যুগের কারু সঙ্গে তাঁদের কখনোই তুলনা চলবে না। তাঁরা হ'লেন স্বর্ণযুগের মানুষ এবং মুসলিম মিল্লাতের জন্য সব চাইতে উপকারী।

তাঁদের পরেই হ'লেন তাবেঈগণ এবং প্রতি যুগের ঐসব আমল সম্পন্ন আলেমগণ, যারা ছিলেন সালাফী তরীকার অনুসারী। যার মূলনীতি সমূহ ইতিপূর্বে আমরা ব্যাখ্যা করে এসেছি। অতএব যে সকল আলেম তাওহীদ, ইত্তেবা ও তাযকিয়াহ্র ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ্র তরীকার অনুসারী এবং যাঁরা প্রকাশ্য শিরক, বাজে তাবীল, ভ্রান্ত সুলূক ও বাতিল ছূফীতত্ত্ব সমূহে নিপতিত হয়নি, তাঁরাই হ'লেন ছাহাবা ও তাবেঈগণের পরবর্তী নেতৃবৃন্দ। আর তাযকিয়াহ্র ক্ষেত্রে এর মধ্যেই সালাফী তরীকা সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। এটিই হ'ল যথার্থ নমুনা। যা আল্লাহ ও তার রাসূলের কালামের শুধুমাত্র যাহেরী রূপ নয়। আর যথার্থ নমুনা দ্বারা আমরা মনে করি, যার মধ্যে বাতেনী ও যাহেরী দু'টি দিকই থাকবে। যা যথার্থ হবে, বানোয়াট নয়। যেখানে ঈমান থাকবে, কপটতা নয়। শুদ্ধিতা ও পবিত্রতা থাকবে, পাপ ও নিন্দাবাদ নয়। সাধ্যমত পবিত্রতা থাকবে, যা মানুষের পক্ষে সম্ভব। যাতে মানুষ এমন যোগ্য হয়ে ওঠে যে, আল্লাহ্র ফেরেশতাগণ তার উপর জান্নাতের দরজায় সালাম দিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলে, 'তোমরা সুখী হও। অতঃপর এখানে প্রবেশ কর চিরকালের জন্য' *(যুমার ৩৯/৭৩)*। অতঃপর আমরা আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন আমাদেরকে ঐসব সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

আল্লাহ বলেন, بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ- 'বরং আমরা সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি। অতঃপর তা ওটাকে চূর্ণ করে দেয়। ফলে তা মুহূর্তেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আর তোমরা যেসব কথা বল সেজন্য আফসোস' *(আম্বিয়া ২১/১৮)*।

দ্বিতীয় অধ্যায় (الباب الثاني)

সালাফী দাওয়াতের উদ্দেশ্য সমূহ

(أهداف الدعوة السلفية)

ইতিপূর্বেকার আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, সালাফী দাওয়াত ঈমানের কোন একটি বিশেষ শাখার প্রতি দাওয়াত নয় কিংবা ইসলামের কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয় বস্তুর দিকে দাওয়াত নয়। এটা কোন সমাজ সংশোধন কিংবা দলীয় রাজনীতির দাওয়াত নয়। বরং এটি শুধুমাত্র ইসলামী দাওয়াত। 'ইসলাম' শব্দটি মর্যাদা, নেতৃত্ব, সংস্কার, ন্যায়বিচার, দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গল প্রভৃতি যত ব্যাপক অর্থেই আসুক, সবকিছুই বুঝিয়ে থাকে। ইসলাম বিশ্ববাসীর জন্য পাঠানো আল্লাহ্র দ্বীন। তা শুধুমাত্র কোন একটি দেশের বা কোন একটি জাতির নয়। বরং তা সমস্ত পৃথিবীর জন্য ও সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য। এমনিভাবে সালাফী দাওয়াত কোন একটি নির্দিষ্ট দেশ বা জাতির জন্য নয়। বরং ইসলাম বুঝার ও তদনুযায়ী আমল করার জন্য এটা একটি সুসংবদ্ধ তরীকা। যেমন আমরা ইতিপূর্বে এই দাওয়াতের ব্যাখ্যায় আলোকপাত করে এসেছি। এক্ষণে আমরা নিম্নে সালাফী দাওয়াতের উদ্দেশ্যগুলি ব্যাখ্যা করব, যা হ'ল ইসলামী দাওয়াতেরই উদ্দেশ্য।-

১. খাঁটি মুসলিম তৈরী করা (إيجاد المسلم الحقيقي) :

ইসলামী শরী'আত সঠিক অর্থে এসেছে, প্রথমতঃ একজন মানুষকে মুসলিম হিসাবে গড়ে তোলার জন্য। আর মানুষ বলতে 'ইনসানে কামেল' বা পূর্ণ মানুষ বুঝায়। অতঃপর একজন মানুষ সে পুরুষ হৌক বা নারী হৌক, তাকে সত্যিকারের 'মুসলিম' হিসাবে গড়ে উঠতে হ'লে তার মধ্যে তিনটি শর্ত থাকতে হবে। তাওহীদ, ইত্তেবা ও তাযকিয়াহ। সত্যিকারের মুসলিম তিনিই, যিনি আল্লাহ্র একত্বের সাক্ষ্য দেন। যিনি আল্লাহ্র নির্দেশ সমূহ পালন ও নিষেধ সমূহ হ'তে সাধ্যমত বিরত থাকেন এবং এই আনুগত্যের মাধ্যমে নিজের আত্মাকে যথাসম্ভব পরিশুদ্ধ রাখেন। উক্ত তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণের

এই পদ্ধতি সমূহ হ'ল সালাফী দাওয়াতের যথার্থ পদ্ধতি, যা ইতিপূর্বে 'মূলনীতি' শিরোনামে আমরা বর্ণনা করেছি।

এক্ষণে যখন আমরা কাউকে যথার্থ মুসলিম বলব, তখন ঐসব তথাকথিত মুসলিম নামধারী লোকেরা অবশ্যই আলাদা হয়ে যাবে, যারা কথায় ও আক্বীদায় শিরকের মধ্যে লিপ্ত। যারা আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে পরিবর্তন করেছে, আল্লাহ্র বিধান ছেড়ে অন্যের দেওয়া বিধানের নিকট তাদের ফায়ছালা পেশ করেছে। যারা নবীর সুন্নাতের বিরুদ্ধে শত্রুতা করে ও তা নিয়ে ঠাট্টা করে। এসব লোকদেরকে মুসলিম হিসাবে গণ্য করা সিদ্ধ হবে না। আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছি আমাদের الحد الفاصل بين الإيمان والكفر ('ঈমান ও কুফরের পার্থক্যকারী সীমারেখা') বইয়ের মধ্যে।

ইসলামের মূল তাৎপর্য ব্যাখ্যার পর সালাফী দাওয়াতের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ। যেমন আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) বলেন, وَاللهِ لأَنْ يَهْدِىَ اللهُ بِكَ رَجُلاً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ– 'আল্লাহ্র কসম! যদি আল্লাহ তোমার দ্বারা কোন একজন বান্দাকে হেদায়াত দান করেন, তাহ'লে সেটা হবে তোমার জন্য লাল উটের চাইতেও উত্তম'।[২৫] অতএব একজন ব্যক্তিকে ইসলামের পথ দেখানো একটি বড় ধরনের নে'মত ও মর্যাদামণ্ডিত সৎকর্ম। সেই ব্যক্তি কোন নেতা হৌক বা গোলাম, ফকীর হৌক বা ধনী, দুর্বল হৌক বা শক্তিশালী। আমাদের জন্য এই প্রমাণই যথেষ্ট যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর রাসূলকে এজন্য তিরষ্কার করেছিলেন যে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতূম নামক একজন অন্ধ ব্যক্তি (পরে ছাহাবী), যিনি তাঁর নিকট হেদায়াত পাবার আশায় এসেছিলেন, তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন এবং জনৈক কুরায়েশ নেতার দিকে মনোনিবেশ করে তাকেই দাওয়াত দিচ্ছিলেন ও দ্বীন বুঝাচ্ছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, عَبَسَ وَتَوَلَّى– أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى– وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى– أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى– أَمَّا مَنِ

---

২৫. বুখারী হা/৩০০৯; মুসলিম হা/২৪০৬; মিশকাত হা/৬০৮০।

اسْتَغْنَى- فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى- وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى- وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى- وَهُوَ يَخْشَى- فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى- 'সে ভ্রূকুঞ্চিত করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল এজন্য যে, তার নিকটে একজন অন্ধ লোক এসেছে। তুমি কি জানো সে হয়তো পরিশুদ্ধ হ'ত। অথবা উপদেশ গ্রহণ করত। অতঃপর সে উপদেশ তার উপকারে আসত। অথচ যে ব্যক্তি বেপরওয়া তুমি তাকে নিয়েই ব্যস্ত আছ। অথচ ঐ ব্যক্তি পরিশুদ্ধ না হ'লে তাতে তোমার কোন দোষ নেই। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তোমার নিকটে দৌড়ে এল, এমন অবস্থায় যে সে (আল্লাহকে) ভয় করে, অথচ তুমি তাকে অবজ্ঞা করলে' *('আবাসা ৮০/১-১০)*।

উপরোক্ত আয়াতগুলিতে ইসলামী দাওয়াতের উদ্দেশ্য ও নীতি-পদ্ধতি পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। এতে বুঝা গেল যে, আল্লাহ যেকোন ব্যক্তির অন্ত রকে ইসলামের জন্য খুলে দিতে পারেন। তিনি যেমন ব্যক্তিই হন না কেন।

২. এমন একটি মুসলিম সমাজ কায়েম করা যেখানে আল্লাহ্র কালেমা উন্নত থাকবে এবং কুফরীর কালেমা অবনমিত হবে

(المجتمع المسلم الذي تكون كلمة الله فيه هى العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى)

সালাফী দাওয়াতের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হ'ল এমন একটি মুসলিম সমাজ কায়েম করা, যা ঐ সমস্ত ইটগুলিকে (লোকগুলিকে) একত্রে জুড়ে দেবে, যারা আক্বীদা ও পদ্ধতিগত দিক দিয়ে ইসলামের বিশুদ্ধ ভিত্তির উপর লালিত হয়েছে। আর তা হ'ল এই যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র জন্য বিধান সমূহ রয়েছে বিভিন্ন ব্যবহারিক বিষয়ে। যেমন দণ্ডবিধি সমূহে, সাধারণ জনকল্যাণ বিষয়ে ও শাসন বিষয়ে। যেগুলি কখনোই চালু করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না সমাজ আল্লাহ্র দ্বীনকে কবুল করে এবং তাঁর প্রেরিত শরী'আতের সামনে মাথা নত করে। সত্যিকার অর্থে কোন মুসলিম শান্তি ও নিরাপত্তা বোধের সাথে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে না একটি মুসলিম সমাজের ছায়া ব্যতীত। যেখানে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী হুকুম করা হয়, তাকে সম্মান করা হয় এবং তার নিদর্শন সমূহকে জীবন্ত করা হয়।

যখন থেকে কাফিররা মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল সমূহের উপর জয়লাভ করেছে ও সেগুলিকে ছিন্নভিন্ন করেছে এবং সেখানে তারা আল্লাহ্র বিধান সমূহের

স্থলে নিজেদের বিধান সমূহ ও জীবন যাপন পদ্ধতি চালু করেছে, তখন থেকেই সকল এলাকার মুসলিম জনসাধারণ এই আপতিত বিপদ থেকে মুক্তি চাচ্ছে এবং ছহীহ শুদ্ধ ইসলামী শাসন বিধানের ছায়াতলে শান্তির জীবন যাপনের জন্য দুর্বার আগ্রহ পোষণ করে আসছে। যেখানে শাসক ও শাসিতের মাঝে মহব্বতের সম্পর্ক বিরাজ করবে। যেখানে যুলুম থাকবে না। মানুষ তাদের সম্পদ ও ইয্যতের নিরাপত্তা পাবে। যেখানে ভালবাসা, ত্যাগ ও অকৃত্রিমতার জয়জয়কার থাকবে। যার মাধ্যমে মুসলিমদের হারানো সম্মান ও মর্যাদা ফিরে আসবে। যাবতীয় যুলুম, সীমালংঘন ও ফিৎনা-ফাসাদ দূর হয়ে যাবে, যা আজ অধিকাংশ দেশে মুসলমানদের উপর আপতিত হচ্ছে।

কিন্তু উক্ত উদ্দেশ্য হাছিলের লক্ষ্যে যে সকল দাওয়াতী পদ্ধতি চলছে, সেগুলি সবই বিভক্ত। সংস্কার ও প্রশিক্ষণের পদ্ধতিগুলি একটি একক লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে এ পথে যেসব ভীতিপ্রদ পরিণাম সমূহ দেখা দিচ্ছে, তা রুখতে কেউ সক্ষম হচ্ছে না। এ সকল পরিণামের মধ্যে উদাহরণ স্বরূপ ইসলামী জাতিগুলির মধ্যে দলবদ্ধভাবে (ইসলাম থেকে) ফিরে যাওয়া। আর এটা হচ্ছে মুসলিম সন্তানদের রীতিমত মস্তিষ্ক ধোলাইয়ের ফলে। যা ইসলাম বিরোধী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রভাবে হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে বড় ধরনের ইন্ধন যোগাচ্ছে বড় বড় প্রচার মাধ্যম সমূহ। যেসবের মালিকানা রয়েছে ইসলাম বিরোধীদের হাতে। আর শিক্ষানীতির মাধ্যমে, যা রচিত হয়ে থাকে সাম্রাজ্যবাদীদের হুকুমে তাদের নীল নকশা অনুযায়ী।

আমি বলতে চাই যে, ইসলামী সমাজ কায়েমের পথে বাধার যে জঞ্জাল সমূহ পতিত হয়েছে, সেগুলিকে দূর করা ইসলামী আন্দোলনের নেতাদের দ্বারা সম্ভব হয়নি। অথচ তাঁরা সন্ধ্যা থেকে সকালের মধ্যেই একশ'-দু'শ, এক হাযার-দু'হাযার লোকের মাধ্যমে (ইসলামী সমাজ) কায়েমের স্বপ্ন দেখে থাকেন। তারা জানেন না যে, ব্যাপারটি এখন অনেক বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। অতএব এখন প্রয়োজন কেবল জিহাদ (সর্বাত্মক প্রচেষ্টা) ও দীর্ঘ ধৈর্য। প্রয়োজন তা'লীম, তারবিয়াত ও ছহীহ-শুদ্ধ ইসলাম প্রচারের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। প্রয়োজন আল্লাহ্র পথে দাওয়াতের ময়দানে সক্রিয় সকলের মধ্যে ইতিপূর্বে বর্ণিত সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ পারস্পরিক সহযোগিতা।

এই মাত্র যেসব দলগুলি নিয়ে আলোচনা করা হ'ল, তাদের ব্যাপারে তোমাকে বিস্মিত করবে এ বিষয়টি যে, এরা যদি কোন ইসলামী সমাজ বা ইসলামী শাসনের কল্পনা করেন, তবে তা কিন্তু ওছমানের খেলাফত কিংবা উমাইয়া বা আব্বাসীয় খেলাফত নয় বরং আবুবকর ও ওমরের খেলাফত কল্পনা করেন। এরূপ কল্পনা করা স্থূল অর্থে সুন্দর। কিন্তু ঐসব ইসলামী আন্দোলনের নেতাদের ও সেদিকে কথিত দাওয়াত দানকারীদের চরিত্রে ও কর্মে, ব্যবহারে ও ইলমের মধ্যে এমন কিছু তুমি পাবে না, যা তাদেরকে এ ধরনের ইসলামী সমাজের নেতা হওয়া দূরের কথা, একজন সাধারণ সদস্য হওয়ারও যোগ্য বানাতে পারে। নিজের বড়ত্ব, আত্মকেন্দ্রিকতা, কৃপণতা, ভীরুতা, একনায়কত্ব, বিরোধী মতের প্রতি অসহিষ্ণুতা, বাতিল বিষয় নিয়ে ঝগড়া করা প্রভৃতি ব্যাধিসমূহ ঐসব অত্যুৎসাহী নেতাদের মধ্যে দেখা যায়। এগুলো অপেক্ষাকৃত হালকা ব্যাধি। এর চাইতে আরও বড় ব্যাধি সমূহ রয়েছে, যেসবের উল্লেখ এখানে রুচি বিরোধী হবে। মোটকথা ইসলামী হুকূমত কায়েমের ঐসব কল্পনাবিলাসীরা পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যকার দূরত্বের ন্যায় তাদের লক্ষ্যস্থল হ'তে অনেক দূরে, যা তারা দাবী করে থাকে। চারপাশের চলন্ত বিষয় সমূহের ব্যাপারে তাদের লজ্জাকর দ্রুততা ও অজ্ঞতা ছাড়াও। এজন্যেই তাদের শক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এবং তাদের কর্মীদের সকল প্রচেষ্টা হাওয়ায় উবে যাচ্ছে। এরা এদের লক্ষ্যস্থল হ'তে দূরে ছিটকে পড়ার কারণ হ'ল এই যে, ইসলাম বুঝা ও সে অনুযায়ী আমল করার জন্য এরা কোন নির্দিষ্ট মূলনীতি রচনা করেনি। আর এর ফলে দাওয়াত দানকারী সদস্যগণ পরস্পরের প্রতি মারমুখী হয়ে ওঠে মোটামুটি তিনটি কারণে।-

(ক) প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে ইজতেহাদ করার কারণে- যা তাদেরকে একটি একক মূলনীতিতে মযবূতভাবে জমায়েত হ'তে দেয়নি।

(খ) কঠিন অথবা তিক্ত বাস্তবতার কারণে, যাকে মুসলিম উম্মাহ জিইয়ে রেখেছে। ফলে দেখা দিয়েছে বিভক্তি, ধ্বংস, নৈরাজ্য অতঃপর ইসলাম থেকে ফিরে যাওয়া।

(গ) বর্তমানে বহু দল বেরিয়েছে। তাদের লোকজনও বেড়েছে। কিন্তু সাথে সাথে তাদের ঐক্য দ্রুত ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। কেননা আক্বীদা,

শরী'আত এবং ইসলাম অনুযায়ী আমলের বুঝ হাছিল করার মূলনীতিগুলি তাদের নিকট স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন নয়।

সালাফী তরীকা উপরের সবকিছুর প্রতি দৃষ্টি দিয়ে থাকে। আর এ কারণেই একটি দৃঢ় মূলনীতির উপর সে তার ভিত্তি স্থাপন করেছে। যাতে কিতাব, সুন্নাহ ও তাওহীদ বুঝা সহজ হয় এবং সত্যের নিকট পৌঁছা যায়। সে তার সদস্যদেরকে ইতিপূর্বে আলোচিত তাওহীদ, ইত্তেবা ও তাযকিয়াহ্‌র মূলনীতি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক যুগে ইসলামী বিশ্বের বর্তমান সমস্যাবলীর দিকেও নযর রাখে। যেসব বড় বড় মন্দ পরিণতি সমূহ মুসলিমদের পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শাসনের ছায়াতলে পূর্ণভাবে ইসলামী জীবন শুরু করার পথে বাঁধা হয়ে আছে, সেগুলির যথাসাধ্য সংশোধনের চেষ্টা করে। ইসলামের জন্য আন্দোলনকারী সকল দলকে ঐক্যবদ্ধ করার সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে থাকে। তবে সবকিছুর মালিকানা আল্লাহ্‌র হাতে। তিনি বলেন,

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ-

'তুমি বল, হে আল্লাহ! তুমি রাজাধিরাজ। তুমি যাকে খুশী রাজত্ব দান কর ও যার কাছ থেকে খুশী রাজত্ব ছিনিয়ে নাও। তুমি যাকে খুশী সম্মানিত কর ও যাকে খুশী অপমানিত কর। তোমার হাতেই যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয় তুমি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাবান' *(আলে ইমরান ৩/২৬)*।

৩. আল্লাহ্‌র জন্য দলীল কায়েম করা (إقامة الحجة لله) :

নবীদের প্রেরণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল অবিশ্বাসী এবং হঠকারীদের ভয় দেখানো। যাতে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সম্মুখে তাদের কোন অজুহাত পেশের সুযোগ না থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন,

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا- وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ

نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا- رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا-

'নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতি 'অহি' প্রেরণ করেছি, যেমন 'অহি' করেছিলাম নূহের নিকট এবং তার পরবর্তী নবীগণের নিকট। আর আমরা 'অহি' করেছি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তার বংশধরগণের প্রতি এবং ঈসা, আইয়ূব, ইউনুস, হারূণ ও সুলায়মানের প্রতি। আর আমরা দাঊদকে যবূর প্রদান করেছিলাম'। 'বহু রাসূল সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা তোমাকে বলেছি এবং অনেক রাসূল সম্পর্কে বলিনি। আর আল্লাহ মূসার সঙ্গে সরাসরি কথোপকথন করেছেন'। 'আমরা রাসূলগণকে জান্নাতের সুসংবাদ দানকারী ও জাহান্নামের ভয় প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছি। যাতে রাসূলগণের পরে লোকদের জন্য আল্লাহ্র বিরুদ্ধে কোনরূপ অজুহাত দাঁড় করানোর সুযোগ না থাকে। আর আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(নিসা ৪/১৬৩-৬৫)*।

রাসূলগণের মৃত্যুর পর তাদের অনুসারীগণ একই মিশন নিয়ে এগিয়ে চলেন, যাতে হঠকারীদের জন্য অভিযোগ করার মত কোন যুক্তি আর না থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন,

قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-

'তুমি বল, এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্র দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র। আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(ইউসুফ ১২/১০৮)*।

অতএব রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসারী কেবল তারাই হ'তে পারেন, যারা নবুঅত ও রিসালাত ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে তাঁর প্রতিনিধি হবেন। অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, আল্লাহ্র বিধান সমূহ চালু করা ও সেদিকে মানুষকে আহ্বান করা, জান্নাতের সুসংবাদ শুনানো ও জাহান্নামের ভয় দেখানো- এসবই ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর কাজ। অতএব তাঁর অনুসারী ও তাঁর তরীকার

উপর যারা চলতে আগ্রহী, তাদের জন্য ঐ একই কাজ সমূহ করা ওয়াজিব হবে।

অতঃপর যাকে দাওয়াত দেওয়া হবে, তিনি হয় দাওয়াত কবুল করে হেদায়াত প্রাপ্ত হবেন এবং (সালাফী দাওয়াতের) প্রথম উদ্দেশ্য পূরণ করে খাঁটি মুসলিম হবেন। অথবা তিনি হঠকারিতা দেখাবেন ও অবিশ্বাস করবেন এবং (সালাফী দাওয়াতের) তৃতীয় উদ্দেশ্য পূরণ করবেন। অর্থাৎ নিজের উপরে দলীল কায়েম করে নিবেন। তখন আল্লাহ্র বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ (যেমন আমি জানতাম না বা আমাকে কেউ আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেয়নি ইত্যাদি) পেশ করার সুযোগ থাকবে না। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ বলেন, لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ– 'তাদেরকে হেদায়াত করার দায়িত্ব তোমার নয়। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়াত দান করে থাকেন' *(বাক্বারাহ ২/২৭২)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلاَغُ 'পৌঁছে দেওয়া ব্যতীত তোমার আর কোন কাজ নেই' *(শূরা ৪২/৪৮)*। তিনি আরও বলেন, إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ 'তুমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র' *(রা'দ ১৩/৭)*।

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, দাওয়াত দেওয়াই হ'ল মূল কাজ। অন্য কিছু নয়। আর হেদায়াত দান করার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র এখতিয়ারে। আল্লাহ একাজটি মেহেরবানী করে তার বান্দাদের মধ্য হ'তে যাকে খুশী তার হাত দিয়ে সম্পন্ন করেন। আল্লাহ আমাদেরকে তার ঐসকল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যাদের হাত দিয়ে তিনি কল্যাণ জারি করতে চান। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

সালাফী দাওয়াতের এই তৃতীয় উদ্দেশ্যটির সার কথা হ'ল- যদি আল্লাহ্র পথে আহ্বানকারীর আহ্বানে কেউ সাড়া না দেয় এবং কেউ হেদায়াত প্রাপ্ত না হয়, তাহ'লে তিনি যেন এই ধারণা পোষণ না করেন যে, অযথা পণ্ডশ্রম হ'ল। বরং তিনি তার মূল দায়িত্ব পালন করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্র জন্য দলীল কায়েম করেছেন। যেন উক্ত হঠকারী ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন তার প্রতিপালকের সম্মুখে কোন ওযর-আপত্তি তুলতে না পারে।

ইসলামের মূল দাওয়াত কালেমায়ে শাহাদাত ছাড়াও অন্যান্য স্তম্ভগুলির ব্যাপারেও দলীল কায়েম হবে। এক্ষণে যে ব্যক্তি কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করল এবং ছালাত ছাড়াই দাবী করল যে, সে ক্বিয়ামতের দিন নাজাত পেয়ে যাবে, ঐ ব্যক্তির উপর বিভিন্ন আয়াত ও হাদীছ সমূহ দ্বারা দলীল কায়েম করা হবে। এমনিভাবে ইসলামের অন্যান্য আরকান-আহকাম, ওয়াজিবসমূহ ও সাধারণভাবে সকল নিষিদ্ধ বিষয় সমূহের ব্যাপারেও দলীল কায়েম হবে। একইভাবে কোন মুসলিম হঠকারীর বিরুদ্ধেও দলীল কায়েম করা ওয়াজিব হবে, যদি সে কোন অপরিহার্য বিষয় পরিত্যাগ করে অথবা কোন নিষিদ্ধ কাজ করে বসে। কেননা এটাও আল্লাহ্র দ্বীনের প্রতি দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এতদসহ সালাফী তরীকা ইসলামের মৌলিক বিষয়, তার শাখা-প্রশাখা সমূহ এবং শিষ্টাচার ও পসন্দনীয় বিষয় সমূহ বর্ণনা করার বিষয়ে অনন্য ভূমিকা পালন করে থাকে। যাতে করে যুগ সমূহের চাহিদা অনুযায়ী ইসলামের উপর পূর্ণভাবে আমল করা সম্ভব হয়। এটা এজন্য যে, সুন্নাত সমূহে অবহেলা করলে তা পরে ওয়াজিব সমূহে অলসতা ডেকে আনবে। আর ওয়াজিব সমূহে অলসতা ক্রমে তাওহীদ বিশ্বাসের মধ্যে ত্রুটি সৃষ্টি করবে। এমনিভাবে অন্যান্য বিষয় সমূহে। বস্তুতঃ ইলম ও আমলের দ্বারা ইসলামী শরী'আতের পুরোপুরি হেফাযত করা সালাফী দাওয়াতের অন্যতম উদ্দেশ্য।

এজন্য সালাফী তরীকায় আমরা কোন একটি হালকা সুন্নাতকে বা ওয়াজিবকে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে কসুর করি না। কেননা আমরা মনে করি যে, এসব শাখাগুলিই আসল বস্তুর সঙ্গে মিলবে। অর্থাৎ এসবের দ্বারাই ইসলাম তার পূর্ণাঙ্গ ও স্বচ্ছ চেহারা নিয়ে যুগে যুগে প্রকাশিত হয়ে থাকে। আর এর ফলেই মুসলিমদের সামাজিক ভাবমূর্তি স্পষ্ট ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত থাকে এবং তখনই আল্লাহ তাদেরকে পৃথিবী ও বিশ্ববাসীর ওয়ারিছ বানান। অর্থাৎ তাদের উপর নেতৃত্ব সোপর্দ করে থাকেন।

অন্যান্য তরীকার লোকেরা দ্বীনের নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন এবং অন্যান্য বিষয়গুলিকে অবহেলা করেন। বরং নির্দিষ্ট কয়েকটি মুখ্য বিষয়ে উৎসাহ দেন ও অন্যান্যগুলি তারা ব্যাখ্যা করতে সংকোচ বোধ করেন। দ্বীনের প্রকৃত তাৎপর্য না বুঝার কারণেই তাদের পক্ষে এটা সম্ভব হয়েছে। কেননা দ্বীনের কোন একটি অংশ, বিষয় ও বিভাগ ছেড়ে দিলে

যে বিষয়ে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, তা আপোষে শত্রুতা ও দুশমনী ডেকে আনবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوْا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ– 'আর যারা বলে আমরা নাছারা, তাদের থেকে আমরা অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। অতঃপর তাদেরকে যা উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা তা বিস্মৃত হ'ল। ফলে আমরা তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ উসকে দিলাম ক্বিয়ামত পর্যন্ত। আর অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানিয়ে দিবেন' *(মায়েদাহ ৫/১৪)*।

এমনিভাবে আল্লাহ্র কিতাবের কিছু অংশের উপর বিশ্বাস ও কিছু অংশের উপর অবিশ্বাসের কারণে আল্লাহ ইহূদীদেরও নিন্দা করেছেন। তাদের এই কুফর বা অবিশ্বাসের অর্থ ছিল আমল ত্যাগ করা (অর্থাৎ আমল ত্যাগ করাই কুফরীর লক্ষণ)। মুসলিমদের মধ্যেও এই ব্যাধির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তারা আল্লাহ্র অনেক উপদেশ এবং রাসূল (ছাঃ)-এর বহু ওয়াজিব বিষয় ভুলে গেছে।

এ কারণেই সালাফী দাওয়াত ইসলামের যাবতীয় আরকান, আহকাম ও কর্মপদ্ধতিকে শামিলকারী একটি ব্যাপক দাওয়াত। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ– 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন' *(বাক্বারাহ ২/২০৮)*।

অতএব শরী'আতের কিছু অংশ মানা ও কিছু অংশ বাদ দেওয়া শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণের শামিল। অথচ এটাকেই বর্তমানে ইসলামী ময়দানে কর্মরত কিছু লোককে তাদের ধারণা মতে দাওয়াতের স্বার্থে হিকমত ও মাছলাহাতের দোহাই দিয়ে বহু ওয়াজিব পরিত্যাগ করা ও হারাম কাজে লিপ্ত হওয়াকে পুণ্য ভাবতে উদ্বুদ্ধ করছে।

মোটকথা আল্লাহ্র জন্য দলীল কায়েম করতে গেলে ইসলামের মূল ও শাখা সবকিছুই বর্ণনা করতে হবে। যেখানে সত্য প্রকাশে কোনরূপ অস্পষ্টতা

থাকবে না। যাতে ক্বিয়ামতের মাঠে ওয়াজিব ত্যাগ করার ও হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার পক্ষে কারো কোনরূপ অজুহাত খাড়া করার অবকাশ না থাকে।

৪. আমানত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকট ওযর পেশ করা

(الإعذار إلى الله بأداء الأمانة)

আল্লাহ্র পথে আহ্বান করা ইসলামে ওয়াজিব। প্রত্যেক মুসলিমের উপর তা আমানত স্বরূপ, যিনি কিছু ইলম রাখেন এবং আল্লাহপাক ইসলামের প্রচার ও প্রসারকার্য যার জন্য সম্ভব করে দিয়েছেন। এ বিষয়ে বহু দলীল রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ– ‘তোমরাই হ’লে শ্রেষ্ঠ জাতি। যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস রাখবে...’ *(আলে ইমরান ৩/১১০)*।

এর অর্থ হ’ল মুসলিমরা কখনোই শ্রেষ্ঠ উম্মত হ’তে পারবে না, উপরোক্ত দায়িত্ব পালন না করা পর্যন্ত। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ– (آل عمران ১০৪)–

‘আর তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা চাই, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। বস্তুতঃ তারাই হ’ল সফলকাম’ *(আলে ইমরান ৩/১০৪)*।

এখানে مِنْكُمْ ‘কিছু’ অর্থে নয় বরং ‘সার্বিক’ অর্থে এসেছে। অর্থাৎ তোমরা সকলে হবে এমন একটি উম্মত, যারা মানুষকে শুধু কল্যাণের পথে ডাকবে। যেমন আমরা বলে থাকি, ليكن منكم رجل صالح ‘তোমাদের মধ্য থেকে একজন ভালো মানুষ হোক’। অর্থাৎ ولتكن أنت رجلا صالحا ‘তুমি একজন ভালো মানুষ হও’। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ- (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)-

'তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কাউকে অপসন্দনীয় কাজ করতে দেখে, তাহ'লে সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করে। যদি না পারে, তাহ'লে যবান দিয়ে। সেটাও যদি না পারে, তাহ'লে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে। আর সেটা হ'ল দুর্বলতম ঈমান'।[২৬] এ বিষয়ে এ ধরনের বহু দলীল রয়েছে।

মুসলিম যখনই কাউকে আল্লাহ্র পথে ডাকে, তখনই সে উপরোক্ত আমানত আদায় করে এবং আল্লাহ্র সম্মুখে কৈফিয়তের হাত থেকে বেঁচে যায়। যেমন বনু ইসরাঈলের একটি দল শনিবারে মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে তাদের মধ্যকার এক দল ঈমানদার লোক তাদেরকে সীমালংঘন করতে নিষেধ করেন এবং আল্লাহ্র গযবের ভয় দেখান। উত্তরে তারা বলেছিল لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا 'তোমরা কেন ঐ সম্প্রদায়কে উপদেশ দিচ্ছ যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন? অথবা কঠিন শাস্তি দিবেন'? জবাবে তারা বলেছিল, قَالُوْا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ- 'তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ওযর পেশ করার জন্য। আর একারণে যাতে তারা (আল্লাহ্র নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে) সতর্ক হয়' *(আ'রাফ ৭/১৬৪)*।

অর্থাৎ আমরা দাওয়াত নিয়ে দাঁড়িয়ে যাই আল্লাহ্র নিকট ওযর পেশ করার জন্য। যাতে আমরা আল্লাহ্র নিকট বলতে পারি যে, হে আল্লাহ! আমরা তোমার দেয়া আমানত সাধ্যপক্ষে আদায় করেছি। এর পরে যেসব ভাইদের নিকট থেকে আমরা নিরাশ হয়েছি, তারা আল্লাহ্র দিকে ফিরেও যেতে পারে। কারণ ভবিষ্যতের জ্ঞান তো কেবল তাঁর নিকটেই আছে। সে কারণেই সালাফী তরীকায় দাওয়াত দানকারীকে অবশ্যই নিম্নোক্ত দু'টি বিষয়কে তার অন্যতম প্রধান বিষয় হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে।-

(১) (দাওয়াতের) আমানত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকট ওযর পেশ করা।

২৬. মুসলিম হা/৪৯; মিশকাত হা/৫১৩৭।

(২) হঠকারী বান্দাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র জন্য দলীল কায়েম করা। এরপর বাকী দু'টি উদ্দেশ্য আল্লাহ্র উপরে ন্যস্ত করতে হবে। চাইলে তিনি তাড়াতাড়ি সে দু'টি বাস্তবায়িত করবেন, চাইলে দেরীতে করবেন। সে দু'টি হ'ল : (১) মানুষের হেদায়াত পাওয়া এবং (২) তাঁর শরী'আত যমীনে কায়েম হওয়া।

প্রথমটি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

إِنَّكَ لاَ تَهْدِيْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ-

'নিশ্চয়ই তুমি হেদায়াত করতে পারো না যাকে তুমি পসন্দ কর। বরং আল্লাহই যাকে চান তাকে হেদায়াত দান করে থাকেন। আর তিনিই হেদায়াত প্রাপ্তদের সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত' *(ক্বাছাছ ২৮/৫৬)*।

দ্বিতীয়টি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِيْ ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ- (النور ৫৫)-

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করে, আল্লাহ তাদের ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতা দান করবেন, যেমন তিনি দান করেছিলেন পূর্ববর্তীদেরকে। আর তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাদেরকে অবশ্যই ভীতির বদলে নিরাপত্তা দান করবেন। (শর্ত হ'ল) তারা কেবল আমারই দাসত্ব করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপরে যারা অবাধ্য হবে, তারাই হবে পাপাচারী' *(নূর ২৪/৫৫)*।

শাসন কর্তৃত্ব দান করা আল্লাহ্র কাজ। 'আল্লাহ স্বীয় কাজের উপর বিজয়ী। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না' *(ইউসুফ ১২/২১)*। এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা কেবল ঐসব লোকদেরই কাজ, যারা মানব সমাজে আল্লাহ্র রীতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়।

সেকারণ সালাফী দাওয়াতের পথে যিনি চলবেন, তিনি কখনোই নিরাশ হবেন না। তার প্রচেষ্টা সমূহ কখনোই বিফল হবে না। কেননা কমপক্ষে তিনি তো তার উদ্দেশ্যের অর্ধেকটা পূরণ করেছেন এবং বাকী অর্ধেকটার জন্য সর্বদা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের প্রত্যাশী আছেন। অর্থাৎ মানুষকে হেদায়াত দান ও ঈমানদারগণের হাতে যমীনের নেতৃত্ব প্রদান। ওটি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। তিনি যাকে চান সেটা প্রদান করবেন। তিনি স্বীয় অনুগ্রহ প্রশস্তকারী ও সর্বজ্ঞ। শেষের অর্ধেকটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র কাজ। বান্দার কাজ নয়। আর সাহায্য কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই এসে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ-

‘হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তাহ’লে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন ও তোমাদের পাগুলিকে দৃঢ় করবেন’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/৭)*।

আমরা মহান আল্লাহকে সাহায্য করতে পারি এভাবে যে, আমরা প্রথমে সত্যিকার অর্থে মুমিন হব। আর সেটা সম্ভব হবে ঈমান ও আমলের পূর্ববর্ণিত তরীকার যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে। অতঃপর আমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জান ও মাল উৎসর্গ করে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে আল্লাহকে ডাকব। আর যাতে আমরা জানি যে, যে ব্যক্তি সর্বাত্মক চেষ্টা করে, সে তার নিজের জন্যেই সেটা করে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জগদ্বাসীর সকল কাজ থেকে বেপরওয়া।

আমরা পূর্ব হ’তে পশ্চিম পর্যন্ত সর্বত্র সকল মানুষকে এই তরীকার পরিচিতি ও পূর্ণ ব্যাখ্যাসহ এই দাওয়াতের উপর ঈমান আনার আহ্বান জানাব। যাতে আমাদের ন্যায় তারাও জানতে পারে যে, ইসলাম বুঝা ও সে অনুযায়ী আমল করার জন্য এটাই হ’ল একমাত্র তরীকা। এর ফলে তারা ঈমানের মিষ্টতা ও স্বাদ অনুভব করবে। কেননা তখন তাদের ঈমান হবে দৃঢ় বিশ্বাস ও ইলমভিত্তিক, তাক্বলীদ (অন্ধ অনুকরণ), উচ্ছ্বাস বা মূর্খতা ভিত্তিক নয়। তাদের আমল হবে দৃঢ়চিত্ত আলেমের ন্যায়, নরমপন্থী কিংবা সাময়িক উত্তেজনায় বিগলিত ব্যক্তির মত নয়, যা খুব সত্বরই উবে যায় ও দুর্বল হয়ে পড়ে।

তৃতীয় অধ্যায় (الباب الثالث)

সালাফী দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য সমূহ

(مميزات الدعوة السلفية)

১. তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা (تحقيق التوحيد) :

দ্বীন বুঝার জন্য বুনিয়াদী বিষয় সমূহের অন্যতম হ'ল দ্বীনের লক্ষ্য ও চূড়ান্ত উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া। আর তা হ'ল তাওহীদ বা আল্লাহ্‌র একত্ব। বস্তুতঃ তাওহীদ হ'ল দ্বীনের সারবস্তু। যখন ঈমানের বিষয়ে আমরা আসব, তখন দেখব যে, তার মূল হ'ল 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। এছাড়া বাকী পাঁচটি রুকন অর্থাৎ ফেরেশতা মণ্ডলী, কিতাব সমূহ, রাসূলগণ, শেষ বিচারের দিন ও তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপন, সবগুলি প্রথম রুকন অর্থাৎ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌'র দিকে ফিরে যাবে। যেমন ফেরেশতাগণ ঐ আল্লাহ্‌র সেনাবাহিনী যাকে তারা ইবাদত করেন, এক বলে জানেন এবং তার হুকুমের তাবেদারী করেন। রাসূলগণ ঐ এক আল্লাহ্‌র দিকেই মানুষকে আহ্বান করেন। কিতাবসমূহ যার মধ্যে সাজানো আছে আল্লাহ্‌রই আদেশ-নিষেধ, উপদেশ, গুণাবলী, তাঁর আনুগত্যশীল ও অবাধ্য বান্দাদের প্রতি আচরণ ইত্যাদি। শেষ বিচারের দিন সেও তো আল্লাহ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন তাঁর বান্দাদের হিসাব-নিকাশের জন্য। তাক্বদীর সেও তো আল্লাহ্‌রই কর্ম ও পরিকল্পনা। মোটকথা পাঁচটি রুকনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল আক্বীদাগত বিষয় উক্ত মূল রুকন তথা তাওহীদের দিকেই ফিরে যাবে। যেমন জান্নাত হ'ল আল্লাহ্‌র বন্ধুদের আশ্রয়স্থল। জাহান্নাম হ'ল আল্লাহ্‌র শত্রুদের শাস্তির কেন্দ্র। এমনিভাবে কবর, হাশর, হিসাব-নিকাশ, মীযান প্রভৃতি যাবতীয় গায়েবী বিষয় সবই তাঁর সৃষ্টি, পরিকল্পনা ও ইচ্ছার ফসল। উপরোক্ত বিষয়গুলির উপর দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ আমাদেরকে নিয়ে যায় একটি মূল বিষয়ের দিকে, সেটি হ'ল এক আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন।

এগুলি হ'ল আক্বীদাগত বিষয়। এক্ষণে আমলের দিকে বিবেচনা করলেও আমরা দেখব যে, সবকিছুই শেষ পর্যন্ত তাওহীদের নিকটে ফিরে যাবে। যেমন

শ্রেষ্ঠতম আমল হ'ল ইবাদত সমূহ। আর ইবাদত সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'ল তাওহীদের পরবর্তী ইসলামের বাকী চারটি রুকন (ছালাত, ছিয়াম, যাকাত ও হজ্জ)। অতঃপর এই রুকনগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'ল 'ছালাত'। আর ইবাদত সমূহকে ইবাদত নামকরণ করা হয়েছে এজন্য যে, এগুলির মাধ্যমে এক আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা যায়। আর নৈকট্য লাভের প্রধান উপায় হ'ল ছালাত। কেননা ছালাতের মধ্যে বান্দা ও আল্লাহ্র মাঝে আহ্বান ও গোপন কথাবার্তা হয়। এর মাধ্যমেই বান্দার দাসত্বের স্বরূপ প্রকাশিত ও সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। বিশেষ করে সিজদার সময়। যেখানে স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির চরম আনুগত্য ও প্রণতির বাস্তব পরাকাষ্ঠা দেখতে পাওয়া যায়। এ কারণে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ– 'বান্দা তার প্রতিপালকের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী হয় যখন সে সিজদায় থাকে। অতএব সে সময়ে তোমরা বেশী বেশী দো'আ কর'।[২৭] কারণ বান্দা যখন এভাবে আল্লাহ্র প্রতি প্রণত ও অনুগত হয়, তখন আল্লাহ তার নিকটবর্তী হন, তাকে ভালবাসেন ও তাকে আশ্রয় দান করেন। এমনিভাবে অন্যান্য সকল রুকন। যেমন 'ছওম'। এর উদ্দেশ্য হ'ল আল্লাহকে স্মরণ করা ও আল্লাহভীরুতার প্রশিক্ষণ নেওয়া। 'যাকাত' গরীবের সাহায্য ও শান্তির কারণ, যা কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাছিলের জন্যই দেওয়া হয়ে থাকে। হজ্জ আল্লাহ্র বড়ত্ব ও তাঁর একত্ব ঘোষণার উদ্দেশ্যেই করা হয়ে থাকে।

যখন তুমি ইবাদত ছেড়ে ইসলামের দণ্ডবিধি সমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করবে, সেখানেও দেখবে যে, দণ্ডগুলি সবই আল্লাহ্র বিধান। এগুলো প্রাচীরের ন্যায়, যা সিদ্ধ ও অসিদ্ধ বিষয় সমূহের মধ্যে পার্থক্য করে থাকে। এই দণ্ডগুলি দুনিয়াতে আল্লাহ্র অবাধ্য বান্দাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সেকারণ এগুলিও তাওহীদ। অথবা তাওহীদের কারণে এবং এক আল্লাহ্র ইবাদতের জন্যই এগুলি নির্ধারিত হয়েছে। এমনিভাবে অন্য যাবতীয় বৈষয়িক বিষয় সবই আল্লাহ্র সীমারেখা ও বিধান সমূহের অন্তর্ভুক্ত। যিনি এগুলি তাঁর সৃষ্টির জন্য মনোনীত করেছেন এবং যিনি এ বিষয়ে বিতর্ককারীর সঙ্গে বিতর্ক করতে অস্বীকার করেছেন। যেমন তিনি বলেন, إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ

২৭. মুসলিম হা/৪৮২; মিশকাত হা/৮৯৪।

–إِيَّاهُ ‘আল্লাহ ব্যতীত কারু শাসন নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ব্যতীত তোমরা অন্য কারু ইবাদত করো না’ *(ইউসুফ ১২/৪০)*।

এমনিভাবে চরিত্র কখনোই সৎ হ’তে পারে না, যদি না তা শরী‘আতের অনুগামী হয়। পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ, আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবের প্রতি সদ্ভাব পোষণ, মানুষের মধ্যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, অভাবগ্রস্তদের প্রতি দয়া প্রদর্শন, ফকীরের প্রতি মমত্ববোধ, সততা, বীরত্ব প্রভৃতি চারিত্রিক গুণাবলী কখনোই সৎ ও মহৎ হ’তে পারে না, যতক্ষণ না তা আল্লাহ্র নির্দেশের সীমারেখার মধ্যে থাকবে। আর কোন কাজেই কেউ কোন ছওয়াব পাবে না, যদি না সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে উক্ত কাজ করে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন,

لاَ خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوْفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيْمًا–

‘তাদের অধিকাংশ শলা-পরামর্শে কোন মঙ্গল নেই। কিন্তু যে পরামর্শে তারা মানুষকে ছাদাক্বা করার বা সৎকর্ম করার কিংবা লোকদের মধ্যে পরস্পরে সন্ধি করার উৎসাহ দেয়, সেটা ব্যতীত। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সেটা করে, সত্বর আমরা তাকে মহা পুরস্কারে ভূষিত করব’ *(নিসা ৪/১১৪)*।

বুঝা গেল যে, উক্ত ভাল কাজগুলির পিছনে যদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাছিলের উদ্দেশ্য না থাকে, তাহ’লে এসবের কোনই ছওয়াব সে পাবে না। এতে প্রমাণিত হ’ল যে, সব কিছুর মূলেই হ’ল তাওহীদ। ইসলামী শরী‘আতের ছোট-বড় সবকিছুই তাওহীদের সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত।

এ কারণেই সকল নবী-রাসূল তাওহীদ নিয়েই প্রেরিত হয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ– ‘প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট আমরা রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং ত্বাগূত থেকে দূরে থাক’ *(নাহল*

১৬/৩৬)। অন্যত্র তিনি বলেন, قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ– 'বল, আমাকে কেবল এ প্রত্যাদেশই করা হয়েছে যে, তোমাদের উপাস্য মাত্র একজন। সুতরাং তোমরা আজ্ঞাবহ হবে কি?' *(আম্বিয়া ২১/১১০)*।

এখানে রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য সীমায়িত করা হয়েছে মাত্র একটি বিষয়ের মধ্যে। আর সেটি হ'ল তাওহীদের প্রতি আহ্বান। যেন কেবলমাত্র তাওহীদের দাওয়াত দানের জন্যই রিসালাতের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

এজন্য পূর্বেকার ও বর্তমান কালের সালাফী দাওয়াতের কর্মীদের একটিই মাত্র চিন্তা হ'ল দ্বীনকে আল্লাহ্র জন্য খালেছ করা এবং তাওহীদকে সার্বিক অর্থে ও সঠিকভাবে বুঝানো।

অতঃপর আল্লাহকে চেনা বা তার মা'রেফাত হাছিল করার যথার্থ তরীকা হ'ল কিতাব ও সুন্নাহ। যে ব্যক্তি রবের উপর ঈমান আনল, অথচ রবকে চিনল না, সে ব্যক্তি যথাযথভাবে আল্লাহ্র একত্ববাদকে স্বীকার করল না। সুতরাং তার উচিত হবে ঠিক সেভাবে আল্লাহ সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করা, যেমনভাবে তিনি নিজের বিভিন্ন গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। যেমন তাঁর রহমত, ইল্ম, শ্রবণ, দর্শন, সৃষ্টিজীব থেকে উপরে অবস্থান, অনুগত বান্দাদের প্রতি ভালোবাসা, অবাধ্য-অবিশ্বাসীদের উপর ক্রোধ, আরশের উপরে অবস্থান, যা সৃষ্টিকুলের উপর ছাদ স্বরূপ। রাসূলগণের সাথে তাঁর কথা বলা, জান্নাতে মুমিনদের নিকট দর্শন দান, মিত্র ও শত্রুদের মধ্যে তাঁর ইচ্ছার বাস্তবায়ন প্রভৃতি যে সকল মর্যাদাপূর্ণ গুণাবলী তিনি নিজের প্রশংসায় বর্ণনা করেছেন। তিনি মহা পবিত্র। তাঁর প্রশংসা আমরা শেষ করতে পারব না। তিনি তেমন যেমন তিনি নিজের ব্যাপারে প্রশংসা করেছেন।

তাওহীদের এই মূলনীতির পরে আরেকটি মূলনীতি এসে যায়। আর তা হ'ল, এই উপাস্যকে ভালোবাসা ও এককভাবে কেবল তাঁর নৈকট্য হাছিল করা এবং সকল প্রকারের শিরক বর্জন করা। অন্যের নিকট প্রার্থনা করা, তাঁকে ছেড়ে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, অন্যকে ভয় করা এবং যাবতীয় মিথ্যা ধারণা ও কল্পনা পরিত্যাগ করা। তাওহীদের অন্যতম মূলনীতি হ'ল, অনুগ্রহকে

এককভাবে আল্লাহ্র দিকে সম্পর্কিত করা। তাঁর কাছ থেকেই কল্যাণ আসে, অন্যের কাছ থেকে নয়। তিনিই মাত্র কষ্ট দূর করেন, অন্য কেউ নয়। এরপর তাওহীদের মূলনীতি আসে, পৃথিবীতে তাঁর বিধান কায়েম করা এবং মতভেদের সময় তাঁর নাযিলকৃত বিধানের নিকট ও তাঁর রাসূলের বিধানের নিকট ফায়ছালা পেশ করা, অন্য কারু কাছে নয়। এরপর তাওহীদের মূলনীতি আসে নিয়তকে খালেছ করা তাঁর নৈকট্য লাভের প্রতি ও আনুগত্যের প্রতি এবং তাঁর পুরস্কার কামনা ও শাস্তির ভয়ের প্রতি। এমনিভাবে তাওহীদের মূল ও শাখা সমূহের সর্বত্র আল্লাহকে সঠিকভাবে চেনা ও তাঁর সঠিকভাবে দাসত্ব করার প্রতি নিয়তকে বিশুদ্ধ করা।

<u>সালাফী দাওয়াত উপরের সবকিছুকে তার লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করে। তারা মানুষকে প্রথমে আহ্বান করে মূল বিষয়টির (القضية الكلية) দিকে। আর তা হ'ল আল্লাহ্র একত্ব (توحيد الله)। অতঃপর তারা যাত্রা শুরু করে এর বিস্তৃত শাখা-প্রশাখা সমূহের দিকে।</u> এভাবে একজন ব্যক্তি সালাফী তরীকায় চলতে থাকে এবং প্রতিদিন তাওহীদের এক একটি সিঁড়ি অতিক্রম করতে থাকে। প্রতিদিন তার জীবনে এক একটি বিষয় যোগ হ'তে থাকে। প্রতিদিন তার দ্বীন বৃদ্ধি পেতে পেতে এমন একটা সময় এসে যায়, যখন সে আল্লাহ্র অনুগ্রহে খাঁটি তাওহীদপন্থী হয়ে যায়।

এখানে সালাফী দাওয়াতের সঙ্গে অন্যান্য ইসলামী দাওয়াত সমূহের পার্থক্য সূচিত হয়েছে, যারা দ্বীনের আংশিক সংস্কারের কাজ করে যাচ্ছেন। কেননা এসব দাওয়াত দ্বীনের শাখা সমূহের এক একটি শাখা নিয়ে কাজ শুরু করেছে। যেমন হুকুমত ও রাজনীতি সংশোধনের বিষয়। এটি দ্বীনের একটি অংশ বিশেষ। আর এই অংশটিকে বাস্তবায়িত করা কখনোই সম্ভব নয়, যদি না সাধারণ লোকদের জমা করা যায় এবং যদি না তারা তা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা থেকে পালিয়ে যায়। যারা অবশেষে তাদেরকে হুকুমত পর্যন্ত পৌঁছে দিতে সহযোগিতা করে। এসব দলের কর্মীরা ধরেই নিয়েছেন যে, লোকদের সংঘবদ্ধ করা সম্ভব নয়, যদি না তাদের আক্বীদাগত ভুল-ভ্রান্তিগুলি সম্পর্কে চুপ থাকা যায়। আর এভাবেই মুশরিকরা তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ডাকে। এমনিভাবে এসব দলে ঐ ধরনের

স্বেচ্ছাচার মতলববাজ লোকেরা ঢুকে পড়ে, যারা কেবল নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব অনুসন্ধান করে। কেননা তারা ধারণা করে যে, এ দলের তরীকায় থাকতে পারলে উদ্দেশ্য হাছিল করা সম্ভব হবে।

এভাবে তারা আক্বীদাগত বিদ‘আত সমূহ ও বাজে কাজ সমূহের ব্যাপারে চুপ থাকে। যাতে তাদের ধারণা মতে সাধারণ লোকেরা তাদের ছেড়ে না যায়। এজন্য তারা مصلحة الدعوة বা ‘দাওয়াতের স্বার্থ’ নামে একটি পন্থার উদ্ভব ঘটিয়েছেন। এর কারণে তারা বহু হারামকে হালাল ও বহু হালালকে হারাম করেছেন। অথচ ইসলামী দাওয়াতের স্বার্থ হ’ল তাকে অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ তাওহীদের উপরে ভিত্তিশীল হ’তে হবে। তার ভিত্তি কখনোই ক্ষমতা লাভ ও রাজনীতির উপর হবে না। হুকুমত ও রাজনীতি সংশোধন অবশ্যই দ্বীনের অংশ। কিন্তু সেটি কখনো দ্বীনের মূল বা সূচনা নয়।

যারা সর্বাগ্রে হুকুমত সংশোধনের কথা বলেন, তারা তাদের বই সমূহে প্রচার করে থাকেন যে, মানুষের প্রতি দয়া, কা‘বা যিয়ারত করা, ইবাদত করা, মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি বাহ্যিক বিষয়। এসব তাদের দাওয়াতের লক্ষ্য নয়। বরং তাদের মূল লক্ষ্য হ’ল নিজেদের রাজনীতি ও শাসন প্রতিষ্ঠা করা। ফলে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা যাদের দাওয়াতের প্রধান লক্ষ্য, তাদের থেকে ওদের লক্ষ্য কত দূরের! যাদের লক্ষ্য হ’ল নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। যদিও তাতে ইসলামের লেবাস পরানো হয়।

সালাফী দাওয়াত অবশ্যই হুকুমত তথা শাসন ব্যবস্থা সংশোধনের জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু তাকে দ্বীনের অন্যান্য নির্দেশের মত একটি অংশ বলে জানে। তারা সেগুলিকে যথাস্থানে যথাযথ গুরুত্ব ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে মর্যাদা দিয়ে থাকে। সেজন্য তারা বিশুদ্ধভাবে ও বৈধপন্থায় সাধ্যপক্ষে অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনগুলির সাথে মিলে চেষ্টা করে থাকে। তারা জনকল্যাণকামী সকল সরকারকে আল্লাহ্র পথে ডাকে। প্রতিষ্ঠিত সকল রাষ্ট্রনেতাকে তাদের পরিমণ্ডলে সর্বত্র ইসলামী বিধান চালু করতে আহ্বান জানায়।

পক্ষান্তরে অন্যান্য আন্দোলনের কর্মীরা সর্বদা শাসকের প্রতি রক্তচক্ষু ও ক্রুদ্ধ থাকেন। যদিও শাসক ইসলামের কোন একটি দিকে আহ্বান করেন বা তার

বিধান সমূহের কিছু অংশ চালু করেন। এটা এজন্য যে, তারা সব সময় শাসক ও ইসলামের মধ্যে দ্বন্দ্ব জিইয়ে রাখতে চান। যাতে তাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকে ও তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার পক্ষে ছাফাই পেশ করা যায়। আর তারা একথাও ভালভাবে উপলব্ধি করেন যে, শাসকগণ যদি একবার ইসলামমুখী হয়ে যান, তাহ'লে তাদের অস্তিত্ব খতম হয়ে যাবে এবং তাদের আন্দোলন মাঠে মারা যাবে। তারা এটি ভালভাবেই অনুভব করেন এবং জেনে শুনেই শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। যদিও তাদের কর্মীদের অনেকেই এটা জানে না। দাওয়াতের ক্ষেত্রে এটাকে তারা এক প্রকার 'আছাবিয়াত' বা জাত্যাভিমান ধরে নিয়েছেন এবং তারা সব সময় এটাই লোকদের দেখাতে চেয়েছেন যে, জনগণের কোনরূপ কল্যাণই হ'তে পারে না, তাদের দেখানো পথে না চলা পর্যন্ত। এর ফলে তারা অন্যান্য স্বগোত্রীয় ইসলামী দাওয়াতগুলির প্রতি শত্রুতা পোষণ করেন, যেমনভাবে রাজনৈতিক দলগুলি পরস্পরে সদা শত্রু ভাবাপন্ন থাকে। তাদের মন খারাপ হয়, যখন অন্যেরা তাদের মর্যাদায় পৌঁছে যায়। যদিও তারা সবাই মুসলিম এবং তাদের চাইতে উত্তম। অথবা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ সংশোধিত হয়ে যান।

এমনি অবস্থা অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনগুলির, যারা সমাজ সংশোধনের জন্য দ্বীনের এক একটি অংশকে তাদের লক্ষ্য বানিয়েছেন। যেমন কেউ মদ্যপানের বিরুদ্ধে, কেউ নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার বিরুদ্ধে, কেউ বদমায়েশ ফাসেকদের ক্লাব বা মিলনায়তনের বিরুদ্ধে। কেউবা দুস্থ-ইয়াতীমদের সাহায্যকল্পে সংগঠন পরিচালনা করে যাচ্ছেন। এসবই এক একটি অংশগত আন্দোলন, যা কিঞ্চিত ফল লাভ ব্যতীত শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে ব্যর্থ হয়। অবশেষে সেখানে ইলম ও আমলের সংকীর্ণ গণ্ডীসমূহে আবদ্ধ কিছু লোক অবশিষ্ট থাকে। অতঃপর তারা বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বরং কখনো তাদের সাথে যুক্ত হয় কুচিন্তার অধিকারী, প্রদর্শনী ও প্রশংসা লোভী কিছু লোক।

উপরোক্ত কাজগুলি ইসলামের এক একটি অংশের কাজ। যদিও এগুলি কাম্য। তবে এগুলি ইসলামের সামগ্রিক দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত থাকা ওয়াজিব এবং এগুলি তাওহীদের মূল কাঠামোর অংশ। যা স্রেফ আল্লাহ্র জন্য খালেছ হ'তে হবে।

আর এজন্যেই সালাফী দাওয়াত প্রথমে দ্বীনকে আল্লাহ্র জন্য খালেছ করতে চায় ও তাওহীদকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তারপর ইসলামের বিধান সমূহ যথার্থ স্থানে যথাযথভাবে কায়েম করতে চায়। যেমন প্রশাসন ও রাজনৈতিক সংস্কার, বিচার ব্যবস্থা সংশোধন, দণ্ডবিধি সমূহ বাস্তবায়ন, সমাজকে বিশৃংখলা হ'তে মুক্তকরণ, ইবাদত সমূহে এবং বৈষয়িক ও চারিত্রিক বিষয়সমূহে পুরুষ ও নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি।

আমি বলি, এই সালাফী তরীকাই হ'ল একমাত্র বিশুদ্ধ ও সঠিক তরীকা। এটিই হ'ল সমস্ত রাসূল ও তাঁদের শিরোমণি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দাওয়াত। যিনি মানুষকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কেবল তাওহীদের দিকেই আহ্বান জানিয়েছিলেন। তারপর একে একে আমল বিষয়ক বিভিন্ন হুকুম নাযিল হয়েছিল। যেমন মাক্কী জীবনে কিছু বিষয় হারাম করা হয়। যা মুসলমানরা সাধ্যমত পালন করে। এমনিভাবে ছালাত ফরয হওয়া, কষ্টে ধৈর্য ধারণ করা সহ অন্যান্য চারিত্রিক ও কিছু বৈষয়িক বিধান নাযিল হয়। অতঃপর মাদানী জীবনে জিহাদ, যাকাত, হজ্জ ও অন্যান্য বিধানসমূহ ক্রমে ক্রমে নাযিল হয়।

আমরা দেখছি যে, দ্বীন রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরেই পূর্ণতা লাভ করেছে। আর দ্বীনের ফরয সমূহের কোন একটিকেও ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। বরং দ্বীনের দাওয়াত ও জিহাদের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে আদেশ সমূহ বাস্তবায়নের জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কেননা আল্লাহ বলেছেন, فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*।

আমাদের উপর ওয়াজিব হ'ল উক্ত প্রচেষ্টা যেন সম্পূর্ণরূপে নবীর তরীকা ও সুন্নাহ অনুযায়ী হয়। অতএব প্রথমে দাওয়াত দানকারীদের মধ্যে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পরে তারা অন্যকে সৎকর্মের দিকে দাওয়াত দিবেন তাদের সাধ্যানুযায়ী অগ্রাধিকার, সামঞ্জস্য ও মুসলমানদের সামাজিক বাস্তবতার অনুকূলে। যাতে তারা তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক তথা সার্বিক জীবনে পূর্ণাঙ্গ দ্বীনকে বাস্তবায়িত করতে পারেন। আর সবকিছুই হবে তাওহীদের গণ্ডির মধ্যে থেকে। যেটি হ'ল ইসলামী আমলের

মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আর এই বৈশিষ্ট্যই হ'ল সালাফী দাওয়াতের সর্ব প্রধান বৈশিষ্ট্য।

অতএব সংক্ষেপে যদি আমরা সালাফী দাওয়াতের পরিচয় দিতে চাই, তাহ'লে বলব যে, তা হ'ল তাওহীদের দাওয়াত। আর তাওহীদ বলতে আমরা বুঝি সেই তাওহীদ, যা দ্বীনের সবকিছুকে শামিল করে। একটু আগেই আমরা যার আলোচনা করে এসেছি।

২. ঐক্যের বাস্তবায়ন (تحقيق الوحدة) :

ইসলামী দাওয়াত সমগ্র মানবজাতির প্রতি দাওয়াত। যেমন আল্লাহ স্বীয় নবীকে বলেন, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ– 'তুমি বল, হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল। যার জন্যই আসমান ও যমীনের রাজত্ব' *(আ'রাফ ৭/১৫৮)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ– 'আর আমরা তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না' *(সাবা ৩৪/২৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً ، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً 'অন্যান্য নবীগণ স্ব স্ব জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। আর আমি সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছি'।[২৮] একই মর্মের বহু আয়াত ও হাদীছ রয়েছে।

কিন্তু যখন মানুষ এই মহান রাসূলের ব্যাপারে মতভেদ করেছে এবং তাদের মধ্যে মুমিন ও কাফের হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ 'তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের

---

২৮. বুখারী হা/৩৩৫; মুসলিম হা/৫২১; মিশকাত হা/৫৭৪৭।

মধ্যে রয়েছে কাফের ও মুমিন' *(তাগাবুন ৬৪/২)*, তখন আল্লাহ তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদেরকে পরস্পরে ভাই হিসাবে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ 'নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পরে ভাই ভাই' *(হুজুরাত ৪৯/১০)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ 'তোমাদের মধ্যে কেউ (পূর্ণ) মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেই বস্তু পসন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পসন্দ করে'।[২৯] অর্থাৎ পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব না থাকলে ঈমানও থাকবে না। এ কারণেই ঝগড়ার সময় বাজে কথা বলাকে 'মুনাফিকের নিদর্শন' হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। আর তা হ'ল ঝগড়ার সময় বাড়তি কথা বলা। বিশ্বাসী সমাজে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের প্রতি উৎসাহ ও তার ভিত্তিকে মযবূত করা এবং আপোষে দলাদলি ও অনৈক্য সৃষ্টির বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ-

'তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে ধারণ কর এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্র সেই নে'মতের কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তর সমূহে মহব্বত পয়দা করে দিলেন। অতঃপর তোমরা তার অনুগ্রহে পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা অগ্নি গহ্বরের কিনারায় অবস্থান করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে সেখান থেকে উদ্ধার করলেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় আয়াতসমূহ ব্যাখ্যা করেন, যাতে তোমরা সুপথপ্রাপ্ত হও' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*।

২৯. বুখারী হা/১৩; মুসলিম হা/৪৫; মিশকাত হা/৪৯৬১।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِى تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى 'পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া প্রদর্শনের ব্যাপারে মুমিনদের তুলনা একটি দেহের ন্যায়। জাগরণে কিংবা জ্বর অবস্থায় তার একটি অঙ্গ ব্যথাতুর হ'লে সমস্ত অঙ্গ ব্যথাতুর হয়ে ওঠে'।[৩০]

তিনি বলেন, لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ 'আমার মৃত্যুর পরে তোমরা একে অপরের গর্দান উড়িয়ে দিয়ে পুনরায় কাফের হয়ে যেয়ো না'।[৩১]

তিনি আরও বলেন, سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ 'মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং তার সঙ্গে লড়াই করা কুফুরী'।[৩২] আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন, যাতে মুসলিম উম্মাহ পরস্পরে ভাই হিসাবে নিকটবর্তী হয়। আর আল্লাহ এজন্য তাদেরকে বহু পুরস্কারও ঘোষণা করেছেন। যেমন হাদীছে এসেছে, যখন কোন ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইয়ের সঙ্গে আল্লাহ্র ওয়াস্তে মোলাকাতের জন্য নিজের গ্রাম (বা বাসা) থেকে অন্যত্র গমন করে, আল্লাহ তাঁকে মাফ করে দেন।[৩৩] এছাড়া তিনি ঐ স্বামী-স্ত্রীকেও ক্ষমা করে দেন, যারা মেহমানকে খাওয়ানোর পর নিজেরা সন্তান-সন্ততি নিয়ে অভুক্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে'।[৩৪]

আর এটা বাস্তব যে, এই বিস্ময়কর ভ্রাতৃত্ববোধের কারণেই প্রাথমিক যুগে ইসলামের ব্যাপক প্রসার লাভ সম্ভব হয়েছিল, যা ছাহাবায়ে কেরামকে কঠিন

---

৩০. মুসলিম হা/২৫৮৬; বুখারী হা/৬০১১; মিশকাত হা/৪৯৫৩।

৩১. মুসলিম হা/১৬৭৯ (২৯) আবু বাকরাহ হ'তে; বুখারী হা/১৭৩৯, ৪৪০৫ ইবনু আব্বাস ও জারীর হ'তে; মিশকাত হা/৩৫৩৭।

৩২. বুখারী হা/৪৮; মুসলিম হা/৬৪; মিশকাত হা/৪৮১৪। এখানে কুফরী বলতে সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ বুঝানো হয়েছে। প্রকৃত কুফরী নয়, যা মুমিনকে ঈমানের গণ্ডী থেকে বের করে দেয়।

৩৩. মুসলিম হা/২৫৬৭; মিশকাত হা/৫০০৭, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।

৩৪. বুখারী হা/৪৮৮৯; মুসলিম হা/২০৫৪; মিশকাত হা/৬২৫২, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।

ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করেছিল। যদি মুহাজির ভাইদের জন্য আনছার ভাইয়েরা বসবাসের ব্যবস্থা না করতেন এবং মুহাজিরগণ আনছার ভাইদের প্রতি অভূতপূর্ব ভালোবাসা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন না করতেন, তাহ'লে এইসব বড় বড় বিজয় কখনোই সম্ভব হ'ত না এবং প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে এত দ্রুত ইসলামের প্রসার লাভ ঘটতো না। এজন্যেই উম্মতের উপর সব চাইতে বড় মুছীবত হ'ল তাদের মধ্যে হঠকারিতা, বিভেদ ও দলাদলি সৃষ্টি হওয়া এবং যে তরবারি তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে পরিচালিত হ'ত, তা নিজেদের উপর পরিচালিত হওয়া।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহকে বলেছিলেন, قَاتِلْ بِهِ مَا قُوتِلَ الْعَدُوُّ فَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً فَاعْمَدْ بِهِ إِلَى صَخْرَةٍ فَاضْرِبْهُ بِهَا... 'তুমি এই তরবারি নাও এবং লড়াই কর। যখন দেখবে আমার উম্মত আপোষে মতভেদ করছে এবং একে অপরকে মারছে, তখন তুমি তরবারিটিকে কোন শক্ত পাথরের উপর মেরে টুকরো টুকরো করে ফেল।.... মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ (রাঃ) তাই-ই করেছিলেন'।[৩৫]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَطِيْعُوْا اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَلاَ تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ- 'তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর। আপোষে ঝগড়া কর না। তাহ'লে তোমরা হীনবল হবে ও তোমাদের শক্তি উবে যাবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন' *(আনফাল ৮/৪৬)*।

বুঝা গেল যে, হীনবল হওয়ার ও বিজয় না আসার একমাত্র কারণ হ'ল দলাদলি। বর্তমান যুগের মুসলিমদের অবস্থাও তাই। বিরাট সংখ্যক উম্মত ও বিপুল সম্ভাবনাময় উত্তরাধিকার থাকা সত্ত্বেও মুসলিম উম্মাহ আজ একটি দুর্বল ছিন্ন ভিন্ন ও পরাজিত জাতি। এই দুর্বলতার একমাত্র কারণ আপোষে দলাদলি ও কলহ-বিবাদ। মুসলিমদের মধ্যে এই ঝগড়া ও দলাদলি প্রবেশ করেছে অনেকগুলি দরজা দিয়ে। তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

---

৩৫. আহমাদ হা/১৮০০৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৬২।

ক. আক্বীদা ও ঈমান বিষয়ক মতভেদ (الإختلاف في العقائد ومسائل الإيمان) :

প্রথমদিকে সামান্য কয়েকটি ছোট-খাট বিষয়ে এই মতভেদ শুরু হয়। যেমন (১) কবীরা গুনাহগার ব্যক্তি যদি বিনা তওবায় মারা যায়, সে কি কাফের হবে, না মুসলিম থাকবে? তার বিরুদ্ধে লড়াই করা চলবে কি চলবে না? মতভেদের এই পথে প্রথম সৃষ্টি হ'ল খারেজী দল এবং পরে মু'তাযিলা সম্প্রদায়। তারপর শুরু হ'ল (২) আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী সংক্রান্ত মতভেদ। আক্বীদাগত এই মতভেদ বিস্তৃত হয়ে বহু প্রশ্নের জন্ম দিল। যাতে মুসলিম উম্মাহ বিভিন্ন দল ও মতে বিভক্ত হয়ে গেল। আল্লামা শাহরাস্তানীর 'আল-মিলাল ওয়ান নিহাল', আব্দুল কাদের জুরজানীর 'আল-ফারকু বায়নাল ফিরাক্ব', আবুল হাসান আশ'আরীর 'ইখতেলাফুল মুসলিমীন ওয়া আক্বায়িদুল মুছাল্লীন প্রভৃতি কিতাবগুলিতে একটু নযর বুলালেই তুমি দেখতে পাবে, তৃতীয় শতাব্দী হিজরী সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই মুসলিমদের মধ্যে আক্বীদাগত দিক দিয়ে কত দলের আবির্ভাব ঘটেছিল। আর আক্বীদাগত বিরোধ স্বাভাবিকভাবেই আমল ও হৃদয়গত বিরোধে পরিণত হয়।

সালাফী দাওয়াতের কর্মীগণ প্রথম থেকেই আক্বীদাগত বিষয় সমূহে যাবতীয় বাজে তাবীল, স্বেচ্ছাচারিতা ও পক্ষপাতিত্ব দূরে নিক্ষেপ করে কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার প্রতি আহ্বান জানিয়ে আসছে। তাদের এই দাওয়াতের বরকতে অধিকাংশ মুসলিম জনগোষ্ঠী আক্বীদার ক্ষেত্রে হক পথের অনুসারী থাকে। বর্তমান যুগের সালাফী দাঈরাও তাদের দাওয়াত ও জিহাদে প্রথম যুগের সালাফী তরীকার উপর চলছেন। তারা উম্মতকে পূর্বের ন্যায় দাওয়াত দিচ্ছেন তাদের আক্বীদাগত বিষয়গুলি স্রেফ কুরআন ও সুন্নাহ থেকে গ্রহণ করার জন্য। আর যাবতীয় বিদ'আতী আক্বীদা-বিশ্বাস, ইজতিহাদ ও গায়েবী ধ্যান-ধারণা সমূহ যেগুলি দাজ্জাল ও কালাম শাস্ত্রবিদরা অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহ সম্পর্কে চাপিয়ে দিয়েছে, সেগুলি দূরে ছুঁড়ে ফেলার জন্য। যাতে মুসলিম উম্মাহ একটি কালেমার উপর একত্রিত হয় এবং তাদের ঈমান ও অন্তর সমূহ এক হয়ে যায়।

খ. আমলগত মতভেদ (الإختلافات العملية) :

বিভিন্ন ইবাদত ও ব্যবহারিক বিষয়ের এই মতভেদ যদিও প্রথমোক্ত আক্বীদাগত মতভেদের তুলনায় কম ক্ষতিকর, তথাপি তা কখনো কখনো

বিরোধ ও বিভক্তির দিকে টেনে নিয়ে গেছে। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিরোধ মাত্রই অপসন্দ করতেন। এমনকি ছোট-খাট ফিক্বহী বিষয়েও। ওমর (রাঃ) ছোট-খাট বিরোধে পিটুনী দিতেন। একবার গোসলের একটি মাসআলায় তিনি বলেন, বীর্যপাত হ'লে গোসল ওয়াজিব হবে, না শুধুমাত্র স্ত্রী-পুরুষের অঙ্গ মিলিত হ'লেই গোসল ওয়াজিব হবে। তোমরা বিষয়টি আয়েশার নিকট থেকে জেনে এসো। আয়েশা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর ঐ হাদীছটি শুনিয়ে দিলেন যে, যখনই স্ত্রী-পুরুষের অঙ্গ পরস্পর মিলিত হবে, তখনই গোসল ওয়াজিব হবে।[৩৬] তখন ওমর (রাঃ) বলেন, যদি আমি শুনি যে এরপরে কেউ অন্যরকম ফৎওয়া দিয়েছে, আমি তাকে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দেব'।[৩৭]

যখন শাখা-প্রশাখাগত সকল ব্যবহারিক বিষয়ে একজনের রায়ের উপর একমত হওয়া সম্ভব না হয়, সে অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা বিরোধপূর্ণ বিষয়কে কিতাব ও সুন্নাহ্র দিকে ফিরিয়ে নিতে বলেছেন *(নিসা ৪/৫৯)*। এটাই ছিল প্রথম যুগের তরীকা। ছাহাবায়ে কেরাম ও তাদের পরবর্তীদের মধ্যে অনেক সময় বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ ঘটেছে। কিন্তু কেউ নিজ নিজ রায়ের উপর যিদ করতেন না এবং তাদের বিরোধীয় বিষয়গুলিকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে নিতেন। এমনই অবস্থা ছিল চার ইমাম সহ সকল ইমাম ও ফক্বীহদের। তারা ফৎওয়া দিতেন। কিন্তু নিজ মতের উপর যিদ করতেন না। বরং তাদের ছাত্রদের বলতেন, তাদের কথা না ধরে যেখানেই হাদীছ পাবে

---

৩৬. তিরমিযী হা/১০৯; মিশকাত হা/৪৪২।

৩৭. হাদীছ كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ 'পানির বদলে পানি' *(তিরমিযী হা/১১০)* এবং إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ 'যখন স্ত্রী ও পুরুষের অঙ্গ পরস্পরে মিলিত হবে, তখন গোসল ফরয হবে' *(তিরমিযী হা/১০৯)*। দু'টি ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, প্রথমটির অর্থ স্বপ্নদোষে পানি দেখতে পেলে গোসল করবে, নইলে নয়। কিন্তু উবাই বিন কা'ব সহ অনেক ছাহাবী মনে করেন উক্ত হাদীছটির হুকুম ইসলামের প্রথম যুগে ছিল, যা পরের হাদীছটি দ্বারা 'মনসূখ' বা হুকুম রহিত হয়েছে। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী মিলনের ফলে বীর্যপাত হ'লেই কেবল গোসল ফরয হবে, নইলে নয়। তখন ওমর (রাঃ) বিষয়টির ফায়ছালার জন্য আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট লোক পাঠালেন। তিনি এসে দ্বিতীয় হাদীছটি বললে ওমর (রাঃ) শেষেরটির উপর রায় দেন এবং এর উপরেই ছাহাবীগণের ইজমা হয় *(বদরুদ্দীন 'আয়নী, নাখবুল আফকার ফী তানক্বীহি মাবানিল আখবার ফী শারহে মা'আনিল আছার (কাতার : ১ম সংস্করণ ১৪২৯ হি./২০০৮ খৃ.) ১/৪৮৪)*।

সেখানেই তা গ্রহণ করতে'। তাদের কোন কথা দলীলের বিরোধী প্রমাণিত হ'লে, তারা তা ছেড়ে দেবার নির্দেশ দিতেন।[৩৮] এর ফলে উম্মতের ঐক্য বহুদিন পর্যন্ত বজায় ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উম্মতের মধ্যে আবির্ভাব ঘটল এমন কিছু লোকের, যারা ইজতিহাদকে এবং সকল বিরোধীয় বিষয়ে কিতাব ও সুন্নাহ্র দিকে ফিরে যাওয়াকে হারাম গণ্য করল এবং সরাসরি দলীল থেকে সমাধান গ্রহণ করার বিষয়টিকে বাতিল ঘোষণা করল এই যুক্তিতে যে, দলীল বুঝার ব্যাপারটি শেষ হয়ে গেছে। এভাবে চার ইমামের কথার বাইরে আমল করাকে তারা হারাম করে দিল। আব্বাসীয়দের পতন যুগে উম্মতের দুর্বলতম সময়ে যখন অনারব (আজমী) ও দাস শাসকরা ক্ষমতা পেল, যারা ভালভাবে আরবীও জানতো না এবং দ্বীনের কিছুই বুঝতো না, তাদের আমলে এটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল। তাক্বলীদ ও পক্ষপাতিত্বের আবির্ভাব হ'ল। মুক্বাল্লিদ ধর্মব্যবসায়ীরা ঐসব মূর্খ শাসকদের চারপাশে জমায়েত হয়ে

---

৩৮. যেমন ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০ হি.) বলেন, إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনো সেটাই আমার মাযহাব' *(ইবনু 'আবেদীন, রাদ্দুল মুহতার (বৈরূত) ১/৬৭)*।

(২) ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯হি.) বলেন- مَا من أحد إِلاَّ ومأخوذ من كَلاَمه ومردود عَلَيْهِ إِلاَّ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وفى رواية : إِلاَّ صَاحبَ هَذَا الْقَبْرِ 'এমন কোন মানুষ নেই, যার সকল কথা গ্রহণীয় ও সকল নিষেধ বর্জনীয়, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর কবরের দিকে ইশারা করে বলতেন, 'এই কবরবাসী ব্যতীত' *(আল-মাদখাল আল-মুফাছছাল (জেদ্দা : ১ম সংস্করণ ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খৃ.) ১/৫৬)*।

(৩) ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হি.) বলেন- إِذا رَأَيْتُمْ كَلَامي يُخَالف الحَدِيث فَاعْمَلوا بِالْحَدِيثِ وَاضْرِبُوا بكلامي الْحَائِطَ 'যখন তোমরা আমার কোন কথা হাদীছের বিরোধী পাবে, তখন তোমরা হাদীছের উপর আমল কর এবং আমার কথা দেওয়ালে ছুঁড়ে মার'।

(৪) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হি.) বলেন- لاَ تُقَلِّدْنِيْ، وَلاَ تُقَلِّدَنَّ مَالِكًا وَلاَ الشَّافِعِيَّ وَلاَ الأَوْزَاعِيَّ وَلاَ النَّخْعِيَّ وَلاَ غَيْرَهُم وَخُذِ الْأَحْكَامَ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا مِنَ الْكتابِ وَالسُّنَّة 'তোমরা আমার তাক্বলীদ করো না এবং তাক্বলীদ করো না মালেক, শাফেঈ, আওযাঈ, নাখ্ঈ বা অন্য কারু। বরং আহকাম গ্রহণ কর, যেখান থেকে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন, কিতাব ও সুন্নাহ থেকে' *(শাহ ওয়ালিউল্লাহ, ইক্বদুল জীদ পৃ. ১১০-১১; থিসিস ১৭৭ পৃ.)*।

(৫) চার ইমামের প্রত্যেকেই বলেছেন, إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبُنَا 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, সেটাই আমাদের মাযহাব' *(আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী, কিতাবুল মীযান (দিল্লী) ১/৭৩)*।

তাদেরকে আহলে সুন্নাত ও সালাফীদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে থাকল। যারা জনসাধারণকে তাক্বলীদ তথা অন্ধ অনুসরণ ও পক্ষপাতদুষ্টতা ছেড়ে স্বাধীনভাবে ইজতিহাদের দিকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন।

ফলে সালাফী দাঈগণ ঐসব লোকদের কাছ থেকে দারুণ মন্দ পরিণতির সম্মুখীন হন। দুষ্ট শাসক ও সুলতানদের চারপাশে জমায়েত হওয়া ঐসব স্বার্থান্বেষী মুক্বাল্লিদ নেতারা সাধারণ লোকদের এই বলে ক্ষেপিয়ে তুলল যে, যারা মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারে দলীল তলব করে এবং ইজতিহাদের কথা বলে, ওরা আসলে চার ইমামের ইলমকে দূরে নিক্ষেপ করতে চায়। এরা তাদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে ও তাঁদেরকে অসম্মান করে। সাধারণ লোক যারা ইমামদের ভালোবাসে ও তাদেরকে সম্মান করে, যারা তাক্বলীদী দাওয়াত ও সালাফী দাওয়াতের মধ্যে পার্থক্য বুঝে না, তাক্বলীদ ও ইজতিহাদ এবং দলীল থেকে সমাধান গ্রহণের বিষয়টি যাদের বোধগম্য নয়, তারা স্বাভাবিক কারণেই এ অপপ্রচারে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ফলে সালাফীদের উপর ত্রিমুখী হামলা নেমে আসে। (১) জাহিল অনারব সুলতানদের পক্ষ থেকে সরকারী নির্যাতন। (২) ত্বাগূতদের ছত্রছায়ায় পেট পূজারী দুষ্ট আলেমগণ এবং (৩) মূর্খ জনসাধারণ। এভাবে বিরোধ চলতে থাকে। অবশেষে ওছমানীয় খেলাফত শেষ হয়ে যায় এবং ইউরোপ থেকে ফিরিংগীরা এসে ইসলামী সাম্রাজ্য দখল করে নেয়। তখন মুসলিমরা নিজেদেরকে সকল জাতি থেকে পিছপা দেখতে পায় এবং কিতাব ও সুন্নাতের দিকে পুনরায় ফিরে যাওয়ার জন্য চিৎকার শুরু করে দেয়।

চারিদিকের ব্যাপক চিৎকার ধ্বনির মধ্যে আমরা আমাদের আমলগুলিকে কিতাব ও সুন্নাত অনুযায়ী করার জন্য সর্বদা চেষ্টিত থেকেছি। যদিও তখন আমাদের চারপাশে এমনসব লোক ছিল, যারা তাক্বলীদী গোঁড়ামী ও জড়তার মধ্যে জীবন যাপন করত। মুসলমানরা শারঈ বিধান ছাড়াই চলুক, এটাই তারা চাইত। তারা দ্বীনের নামে যেকোন কথাই গ্রহণ করা সিদ্ধ মনে করত। কেউ ধারণা করত যে, ইজতিহাদ বাতিল। দ্বীন সীমায়িত হয়ে গেছে চার ইমামের মধ্যে এবং তাঁদের অনুসরণ করাই মুসলিমদের উপর ওয়াজিব। কেউ সালাফী দাঈদের ইমামগণের শত্রু হিসাবে অপবাদ দিত। বরং চার ইমামের কোন

একজনের অনুসরণকে মুসলমানদের উপর ওয়াজিব বলত। আর যে ব্যক্তি দলীলের অনুসরণ করবে এবং কিতাব ও সুন্নাতের দিকে ফিরে যাবে, সে হবে বাতিলপন্থী ও বিদ'আতী।

আমি বলি, মুসলিমদের মধ্যে উপরোক্ত আক্বীদার লোক চিরদিন ছিলেন। তারা লোকদের চিরকাল এ পথে আহ্বান জানিয়ে গেছেন। কারণ এটি নিশ্চিতভাবে জানা কথা যে, কোন একটি বিষয়ে ইমামদের একটি, দু'টি, তিনটি এমনকি চারটি মতও রয়েছে। যেমন বলা হয়ে থাকে যে, এ বিষয়ে ইমাম শাফেঈ পূর্বে (ক্বাদীম) একথা বলেছিলেন, পরে (জাদীদ) একথা বলেছেন। এভাবে বিভিন্ন ফিক্বহী বিষয়ে ইমামদের মতভেদ খুবই স্পষ্ট। যদিও ব্যবহারিক বিধানগুলি একই ধরনের হওয়া ওয়াজিব ছিল। কিন্তু এসব বিষয়গুলিতেও যেখানে ফিক্বহ শাস্ত্রবিদ ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে, সেখানে কিভাবে মুসলিম ঐক্য পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হ'তে পারে?

যদি আমরা বলি যে, আমরা অমুক ইমামের কথা সমর্থন করি, তাহ'লে এটাও হবে এক ধরনের যিদ। কেননা উক্ত ইমাম মা'ছূম বা ভুলের ঊর্ধ্বে নন যে, আমাদের সমস্ত ব্যাপারে তার দেওয়া সকল সিদ্ধান্ত অবনত মস্তকে মেনে চলতে হবে।

যদি বলি সকলের সকল কথা মানতে হবে, তাহ'লে সেটাও হবে আর এক বিরোধ ও বিভেদের ঝামেলা। যেমন ইসলামী আদালতে যদি এমন একটি মামলা আসে যে, মনে করুন... একটি মেয়ে তার অলীর বিনা অনুমতিতে বিয়ে করেছে। এক্ষণে তার বিয়ে সিদ্ধ হবে, না অসিদ্ধ হবে? কোন মাযহাব অনুযায়ী তার বিয়ে সিদ্ধ, আবার কোন মাযহাব অনুযায়ী তার বিয়ে বাতিল। চাই তাদের মধ্যে মিলন ঘটুক বা না ঘটুক। তাহ'লে এমন অবস্থায় বিচারক কি রায় দিবেন?

যদি বলি যে, কোন একটি মাযহাবের রায়কে চূড়ান্ত বলে রায় দেওয়া হবে। তাহ'লে প্রশ্ন আসবে সেটা কি আপনার ইচ্ছামত? দ্বীনের মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতার তো কোন স্থান নেই। আর যদি বলা হয় যে, না দলীলের ভিত্তিতে রায় চূড়ান্ত করা হবে। তাহ'লে তো সেটাই হ'ল সালাফী তরীকা। কেননা আমাদের মতে, যখন কোন বিষয়ে ইমামদের মতভেদ ঘটবে, সেখানে যে ইমামের রায়

দলীলের যত নিকটবর্তী হবে, সেটাই গ্রহণযোগ্য হবে। মোটকথা দলীল অনুযায়ীই চিরকাল ফায়ছালা হবে। আর এটাই হ'ল ইসলামী ঐক্য সৃষ্টির একমাত্র মানদণ্ড।

সালাফী দাওয়াতের এটি হ'ল একটি দিক। আর তা হ'ল যাবতীয় ব্যবহারিক বিষয়ে শারঈ বিধানের ঐক্য কামনা। এটা সম্ভব হবে চার ইমামের সকলের প্রতি ভালোবাসা বজায় রেখে সকলকে সমান নযরে দেখে যার যে কথাটি দলীলের দিক দিয়ে অধিক শক্তিশালী ও হক হবে, তার কথাটি কোনরূপ যিদ ছাড়াই গ্রহণ করা। আর এভাবেই তারা আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন এবং আমরাও সেদিকে দাওয়াত দিয়ে থাকি। বস্তুতঃ এটাই হ'ল বিধানগত ও ব্যবহারগত অনৈক্য থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়। এর ফলে অবশ্যই উম্মতের মধ্যে জন্ম নেবেন মুজতাহিদ বিদ্বানগণ, যারা মুসলিম উম্মাহ্র বাস্তব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা উপলব্ধি করবেন এবং কিতাব ও সুন্নাহ্র আলোকে উক্ত অবস্থা সমূহের মুকাবিলায় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এ ব্যাপারে তারা কোনরূপ একদেশদর্শিতা না রেখে সকল মতের ইমাম ও ফক্বীহদের চিন্তা ও গবেষণা থেকে আলো নিবেন। এক্ষেত্রে তারা অবশ্যই হকের সঙ্গে থাকবেন, কোন ব্যক্তির সঙ্গে নয়। তারা দলীল দেখে হক যাচাই করবেন, ব্যক্তি দেখে নয়। বলা বাহুল্য এটাই হ'ল সালাফী দাওয়াতের সবচেয়ে প্রকাশ্য ও উজ্জ্বল দিক। তারা হকের সন্ধানী। দলীলের মাধ্যমেই তারা সবকিছু সমাধান করে থাকেন। মর্যাদাবান আলেমদের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা বজায় রাখা সত্ত্বেও তাদের ঐ সকল কথা সালাফীরা গ্রহণ করেন না, যেগুলি দলীলের বিরোধী প্রমাণিত হয়।

অতঃপর হক যেমন এক, অসংখ্য নয় এবং সালাফীরাও হকের সন্ধানী, ব্যক্তি পূজারী নন, সেকারণ তারা মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্যের হেফাযতকারী। সমাজে চিরদিন অনুসারী লোকের সংখ্যা অধিক থাকে। এক্ষণে প্রত্যেক লোকের যদি এক একটি অনুসারী দল থাকে, তাহ'লে দলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যখন দলীয় নেতারা বিভিন্ন মতের হন, তখন স্বাভাবিকভাবে দলগুলিও বিভিন্ন মতের হয়ে যায়। এভাবেই মুসলিম উম্মাহ বিভক্ত হয়ে গেছে।

পক্ষান্তরে যখন পারস্পরিক যোগসূত্র হবে হক-এর মাধ্যমে ও হক-এর জন্য এবং ব্যক্তিকে পরিমাপ করা হবে হক-এর দ্বারা। আর তাদের কথার উপর

পক্ষপাতিত্ব করা হবে না, তখন সেখানে মূলতঃ একটি দলই কায়েম হবে- জামা'আতুল হক বা সত্যের দল। যেখানে লোকেরা পরস্পরকে সম্মান করবে ও বিদ্বানদের কথা মেনে চলবে হকের প্রতি তাদের আনুগত্য ও অনুসরণের উপর ভিত্তি করে।

এজন্যই আমরা বলি যে, সালাফী দাওয়াত হ'ল উম্মতের ঐক্যের দাওয়াত। যা ব্যবহারিক জীবনে একক বিধান চালু করতে চায় কিতাব ও সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে। ইমামদের কথা তারা গ্রহণ করবে। কিন্তু কোন একজনের রায়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবে না। অতএব হে আমার জাতি! এই দাওয়াতের মধ্যে কোন ত্রুটি আছে কি?

৩. ইসলামের বুঝকে সহজবোধ্য করা (تيسير فهم الإسلام) :

আল্লাহ তা'আলা ইসলামী দ্বীনকে ও তাঁর নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরণ করেছেন এবং যেহেতু মানুষের মধ্যে মেধা ও বুঝের তারতম্য আছে, সেকারণ আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন স্বীয় প্রেরিত দ্বীনকে কেবল ব্যবহারগত দিক দিয়েই নয়, বরং জ্ঞানগত দিক দিয়েও সহজ করে দিয়েছেন। অতএব দ্বীনের বুনিয়াদী সত্যগুলি উপলব্ধি করা খুবই সহজ। চাই তা আক্বীদা-বিশ্বাসগত হৌক কিংবা জ্ঞানগত ও বিধানগত হৌক। যেমন তাওহীদের বিষয়টি অল্প কথায় ও স্বল্প সময়ের বৈঠকেই বুঝা সম্ভব ঐ ব্যক্তির জন্য, যিনি কুরআন ও সুন্নাহ্‌র জ্ঞানে প্রকৃত জ্ঞানী। এমনিভাবে ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদী ফরযের হুকুম-আহকাম মোটামুটিভাবে যেকোন স্বল্পবুদ্ধির লোক অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝে নিতে পারে। যেমন ওযূ ও ছালাতের নিয়ম-কানূন, ছিয়াম ও হজ্জের বিধি-বিধান সমূহ, যাকাতের মাসায়েল প্রভৃতি আয়ত্ত করতে যে কারু পক্ষেই এক-দু'ঘণ্টা বা আরও স্বল্প সময়ে শিখে নেওয়া সম্ভব হয়। যদি সেটি কোন বিদ্বান ব্যক্তি শিক্ষা দেন।

মোটকথা ইসলাম বুঝ ও জ্ঞানের দিক দিয়ে এবং আমলের দিক দিয়ে একটি সহজ জীবন পদ্ধতি। কোন দিক দিয়েই এতে কোন কাঠিন্য নেই। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. 'আর আমরা

কুরআনকে উপদেশের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব আছে কি কেউ উপদেশ গ্রহণকারী?' *(ক্বামার ৫৪/১৭)*।

ইসলামী শরী'আতের ভিত্তি হিসাবে আল-কুরআন যে যিকর বা চিন্তা-গবেষণার জন্য খুবই সহজ, অত্র আয়াত তার স্পষ্ট দলীল। আর যিকর ইল্ম ও আমলকে শামিল করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا 'নিশ্চয়ই এই দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি এই দ্বীনকে কঠিন করে, দ্বীন তাকে পরাজিত করে। অতএব তোমরা মধ্যপন্থার উপরে দৃঢ় থাক ও সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য সন্ধান কর'।[৩৯] ইসলাম বুঝা ও তার উপর আমল করা যে সহজ, উক্ত হাদীছ তার অন্যতম দলীল।

কিন্তু এই সহজ-সরল দ্বীন আজ মানুষের নিকট অবোধ্য করে তোলা হয়েছে এবং পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ হ'তে সরাসরি ফায়েদা হাছিলের পথ লোকদের জন্য রুদ্ধ করা হয়েছে। ফলে ইসলাম এখন রূপকথার গল্প সমূহের মত হয়ে গেছে। এর কারণ হ'ল ইসলাম বিষয়ক শাখা-প্রশাখা সমূহের জন্য বিভিন্ন পরিভাষার ছড়াছড়ি। ইলম ও মা'রেফাতের (নামে আলাদা পরিভাষা) সৃষ্টি হ'ল, যাতে ইসলামের কিছুই নেই। যদিও আমরা ওগুলিকে উপরোক্ত নামে নামকরণ করেছি। কুরআন ও সুন্নাহ বুঝার মাধ্যম তথা আরবী ভাষার ব্যাকরণ ও উছূলে ফিক্বহ বিষয়ে দারুণ বাড়াবাড়ি শুরু হ'ল। ফলে উপরোক্ত বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তিগণও তাদের মূল লক্ষ্য কুরআন ও হাদীছ বুঝার ক্ষেত্রে অপারগ হয়ে পড়লেন। এমনকি ইসলামের অন্যান্য শাখা-প্রশাখাগুলি সম্পর্কেও তারা অজ্ঞ হয়ে রইলেন। এমনকি আমরা আরবী সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকেও দেখছি যে, কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে কিছুই জ্ঞান রাখেন না, সামান্য কিছু ব্যতীত। এমনিভাবে উছূলে ফিক্বহে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি তাওহীদ ভাল বুঝেন না। এমনকি তিনি ওযূর নিয়মটাও ভালভাবে জানেন না। জানেন না কুরআন ও সুন্নাহ হ'তে কোন বিষয়ের সঠিক সমাধান বের করতে। বরং তার চাইতে

৩৯. নাসাঈ হা/৫০৩৪; বুখারী হা/৩৯; মিশকাত হা/১২৪৬।

কঠিন ও তিক্ত বিষয় হ'ল এই যে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বর্তমানে এমন সব আলেম তৈরী করছে, যারা মিম্বরে ও স্টেজে দাঁড়িয়ে লোকদের নিকট উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা করেন। কিন্তু ছহীহ ও মওযূ' হাদীছ এবং বানাওয়াট কথাসমূহের পার্থক্য বুঝেন না। এভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন শাখার উপরে পৃথক পৃথক বিশেষজ্ঞ তৈরী করছে, যারা ইসলামের সামষ্টিক জ্ঞান অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছেন।

এমনিভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি কিছু ধর্মীয় পুরোহিত (كهانة دينية) সৃষ্টির কাজে পরস্পরে অংশগ্রহণ করেছে। তারা লোকদের কাছ থেকে দ্বীন গোপন (محجوب) করেছে ঐসব আলেমদের মাধ্যমে যারা নিজেদেরকে দ্বীনের 'অছি' (أوصياء) বা তত্ত্বাবধায়ক বলে দাবী করেন। যখন তুমি তাদের কাছে কোন একটি বিষয় বুঝার জন্য দলীল সন্ধানের উদ্দেশ্যে আসবে, তখন তারা বলবেন, আমাদের সঙ্গে তর্ক করো না। আমাদের কথা মেনে নাও, দলীল জিজ্ঞেস করো না'। এটা এজন্য যে, তারা তোমার জ্ঞান চক্ষুকে বন্ধ করে দিতে চায় এবং মানুষকে অজ্ঞ রেখে অন্ধের মত তাদের পিছনে ঘুরাতে চায়।

সালাফী দাওয়াতের প্রধান প্রচেষ্টা হ'ল মানুষের জন্য ইসলামের বুঝকে সহজ করে দেওয়া। আর তা হ'ল সমস্ত মানুষের নিকট কিতাব ও সুন্নাহ্র শিক্ষা ও জ্ঞান সহজ ও স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়ার সমস্ত পথ খুলে দেয়া। যাতে এই জ্ঞান সকলের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। মানুষ যেন কুরআন ও সুন্নাহ্র সাথে যুক্ত হয় এবং তা অনুধাবন করে ও তার বুঝ হাছিল করে। সেই সাথে দ্বীন ও আমলের বুঝ যেন কেবলমাত্র বিশেষ পোষাকের ও বিশেষ চাল-চলনের একদল লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে। বরং ইসলামের জ্ঞান হবে সকলের জন্য উন্মুক্ত। যেমন মুক্ত বায়ু থেকে আমরা নিঃশ্বাস নিয়ে থাকি।

আল্লাহ্র রহমতে এর প্রভাব আমরা আমাদের ভাইদের মধ্যে দেখতে পাই। যখনি তারা সালাফী পদ্ধতি অনুযায়ী ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনা করেন, তখনি অল্পদিনের মধ্যেই তারা যথেষ্ট জ্ঞানী বনে যান। আক্বীদা, ব্যবহারিক জ্ঞান ও আচরণের দিক দিয়ে দ্বীনের মোটামুটি বিষয়গুলি সম্পর্কে পরিষ্কার ও সম্যক

জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার কারণে এবং দৈনিক তার ইলম বৃদ্ধির প্রচেষ্টার কারণে। অবশ্য তার জন্য চিকিৎসককে তার চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারকে তার পেশা ও ব্যবসায়ীকে তার ব্যবসা ছাড়তে হয় না। এটা এজন্যই সম্ভব হয় যে, সালাফী পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে তার দ্বীন বুঝবার বিভিন্ন পথ-পন্থার সন্ধান দেয়। ফলে তিনি ইসলামের মূলনীতি সমূহ এবং আক্বীদা ও আহকাম বিষয়ের মূল সূত্রগুলি অবহিত হন। অবহিত হন কিভাবে একজন ব্যক্তি তাক্বলীদের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন চিন্তার অধিকারী হ'তে পারেন। কিভাবে আলেমদের কথার উপর গোঁড়ামি না করেও তাদেরকে সম্মান দেখানো যায়। অবহিত হন কিভাবে হক গ্রহণ করতে হয়, যেখান থেকেই তা পাওয়া যাক না কেন, যদি তা দলীল দ্বারা শক্তিশালী হয়। কিভাবে বাতিলকে পরিত্যাগ করতে হয়, যে সূত্র থেকেই তা পাওয়া যাক না কেন, যদি তার বাতিল হওয়ার দলীল পাওয়া যায়। এভাবেই ইসলাম খুব সহজে বোধগম্য হয়।

এই সহজবোধ্যতা বিগত যুগে যত না যরূরী ছিল, বর্তমান যুগে তা আরও অধিক যরূরী এবং আমাদের জন্য অধিক প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে। কেননা এ যুগের মানুষ তাদের সমস্ত জীবনটাই বলতে গেলে দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জনের মধ্যে লিপ্ত রাখে। আধুনিক সভ্যতা তাদেরকে ধ্বংস করার পিছনে সর্বদা লেগে আছে। লোকেরা পার্থিব জীবন-জীবিকার পিছনে তাদের সর্বশক্তি নিয়োজিত রেখেছে। আর সে কারণেই সালাফী শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি একটি পূর্ণাঙ্গ ও নিরাপদ পদ্ধতি। কেননা এটি মানুষের কাছ থেকে খুব কম সময় নেয় এবং তাকে সর্বাধিক ফায়েদা প্রদান করে। ফলে একজন ব্যক্তিকে তার সমস্ত জীবন শেষ করতে হয় না কোন মাসআলায় হাশিয়া, টীকা-টিপ্পনী, শাখা-প্রশাখা ও অন্যান্য অনর্থক বিষয় সমূহ জানার জন্য। যা তার দ্বীনের বা দুনিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নয়। বরং সালাফী দাওয়াত প্রধানতঃ দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলির দিকে মনোনিবেশ করে। অতঃপর ঈমান ও আক্বীদা শুদ্ধ করার জন্য তাকে তাওহীদের মূলনীতিগুলি শিক্ষা দেয়। অতঃপর আমল শুদ্ধ করার জন্য ও সৎকর্মশীল হওয়ার জন্য ইবাদতের মূলনীতিগুলি শিক্ষা দেয়। অমনিভাবে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠনের জন্য শুদ্ধিতার মূলনীতিগুলি তা'লীম দেয়। সবকিছুই হয় কিতাব ও সুন্নাহ থেকে। যেন একজন সালাফী তার যাবতীয় কাজকর্ম আল্লাহ ও রাসূলের কালাম অনুযায়ী করতে অভ্যস্ত হয়।

আল্লাহ্র যে কালামকে তিনি ‘রূহ’ ও ‘নূর’ এবং রাসূলের যে কালামকে তিনি ‘হিকমত’ ও ‘হেদায়াত’ নামে অভিহিত করেছেন।

তৃতীয় এই বিষয়টিই হ’ল সালাফী তরীকায় পদচারণার প্রধান বৈশিষ্ট্য। যা নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর তরীকা। যা তিনি অতি অল্প আয়াসে ও স্বল্প প্রচেষ্টায় সমস্ত উম্মতকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাঁর ছাহাবীগণও সেটা করে গিয়েছেন। যেমন ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, كَانُوا أَبَرَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا ‘...ছাহাবীগণ ছিলেন এই উম্মতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী, গভীর জ্ঞানী ও সর্বাপেক্ষা কম ভানকারী’।[৪০] এভাবে আমরা মনে করি সালাফী উত্তরসুরীগণ তাদের প্রথম যুগের নেতৃবৃন্দের ন্যায় উপরোক্ত বিশেষ গুণ সমূহের অধিকারী হবে।

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك،

اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب-

*****

دین کافر فکر وتدبیر وجهاد + دین ملاّ فی سبیل اللہ فساد

‘কাফেরের দ্বীন হ’ল চিন্তা, গবেষণা ও জিহাদ

মোল্লার দ্বীন হ’ল আল্লাহ্র রাস্তায় ফাসাদ’ *(ইকবাল : জাবেদ নামা)*।

৪০. রাযীন, মিশকাত হা/১৯৩; ইবনু আব্দিল বার্র, জামে‘উ বায়ানিল ‘ইলমি ওয়া ফাযলিহী ২/৯৭ পৃ. ১৮১০; সনদ মুনক্বাতি‘ হ’লেও ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে ‘হাসান’ সনদে একই মর্মে বর্ণিত ‘আছার’ দ্বারা প্রমাণিত *(আবু নু‘আইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া ১/৩০৫ পৃ.)*; হেদায়াতুর রুওয়াত হা/১৯১, টীকা-২।

সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি

এক নযরে

১. সালাফী দাওয়াত বলতে ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বিশুদ্ধ ইসলামের দাওয়াতকে বুঝায়।

২. সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি হ'ল ৩টি : তাওহীদ, ইত্তেবা ও তাযকিয়াহ তথা আল্লাহ্র একত্ব, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ ও আত্মশুদ্ধি অর্জন।

৩. সাধারণ ধারণা মতে তাওহীদ অর্থ তাওহীদে রুবূবিয়াত তথা আল্লাহ ব্যতীত কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। কিন্তু সালাফী আক্বীদা মতে তাওহীদের মূলনীতি হ'ল চারটি : (ক) তাওহীদে আসমা ও ছিফাত তথা কোনরূপ পরিবর্তন ও দূরতম ব্যাখ্যা ছাড়াই আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর একত্বের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যেমনটি তাঁর উপযোগী *(১৭ পৃ.)*। (খ) ইবাদতের জন্য আল্লাহকে একক গণ্য করা *(২০ পৃ.)*। (গ) ঈমান আনা এ ব্যাপারে যে, মানুষের দুনিয়াবী জীবনে প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে বিধান রচনার একমাত্র হকদার হ'লেন আল্লাহ *(২১ পৃ.)*। (ঘ) তাওহীদের উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের প্রতিটিই লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য এক একটি রুকন বা স্তম্ভ *(২৩ পৃ.)*।

৪. ইত্তেবা : অর্থ অনুসরণের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে একক হিসাবে মান্য করা। যা কালেমায়ে শাহাদাতের দ্বিতীয় অংশের দাবী *(২৫ পৃ.)*।

৫. ইত্তেবা যথার্থ হ'তে পারে না চারটি বিষয় ব্যতীত। (ক) একথা জানা যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় মহান প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে বান্দাদের প্রতি একজন মুবাল্লিগ বা প্রচারক ছিলেন। তিনি দু'টি 'অহী' নিয়ে এসেছিলেন। একটি আল্লাহ্র কিতাব। অন্যটি তাঁর সুন্নাহ *(২৬ পৃ.)*। (খ) দ্বীন হ'ল- একটি পদ্ধতি, একটি তরীকা ও একটি ব্যাপক (সামাজিক) রঙের নাম। কেবল আল্লাহ্র সঙ্গে বান্দার একান্ত সম্পর্ক মাত্র নয়। এর অর্থ হ'ল, আল্লাহ্র হুকুম অনুযায়ী তাঁর রাসূল (ছাঃ) হ'লেন মানুষের সার্বিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের বিধানদাতা। অতএব ব্যবসা-বাণিজ্য,

বিবাহ-তালাক, শাসন ও রাজনীতি এবং দণ্ডবিধি সমূহ প্রভৃতি বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছকে অমান্য করা ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ প্রভৃতিকে অমান্য করার ন্যায় গুনাহের কাজ *(২৬ পৃ.)*। (গ) পূর্বোক্ত দু'টি বিষয়ের আলোচনায় রাসূল (ছাঃ)-এর মর্যাদা এমন এক স্তরে উন্নীত হয়েছে, যার নিকটবর্তী হওয়া কোন মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। সেকারণ তার বিরোধিতায় দুনিয়ার কারু কোন কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। চাই তিনি ইমাম, ফক্বীহ, নেতা, রাজনীতিক, চিন্তাবিদ, সমাজ সংস্কারক যিনিই হৌন না কেন। যে ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর কথার পরেও অন্য কারু কোন কথা পেশ করল, সে ব্যক্তি মন্দ কাজ করল, সীমালংঘন করল ও যুলুম করল। সে ব্যক্তি কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মতের বিরোধিতা করল *(২৭ পৃ.)*। (ঘ) ইত্তেবা বা অনুসরণ কখনোই পূর্ণাঙ্গ হবে না রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি পূর্ণ ভালোবাসা ব্যতীত *(২৭ পৃ.)*।

৬. ইত্তেবা দুর্বল হওয়া এবং রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ভালোবাসার অনুভূতি প্রশমিত হওয়ার কারণ ৪টি : (ক) তাক্বলীদকে জায়েয গণ্য করা (খ) ইলম ও দলীল ছাড়া ফৎওয়া দেওয়া (গ) কুরআন ও সুন্নাহ্র পঠন ও পাঠনের পথ রুদ্ধ করা (ঘ) জীবনের বহু ক্ষেত্র হ'তে শরী'আত অনুযায়ী আমল বন্ধ করা।

৭. তৃতীয় মূলনীতি : তাযকিয়াহ বা শুদ্ধিতা। এতে দু'টি বিষয় রয়েছে : (ক) রাসূল আগমনের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল আত্মশুদ্ধি আনয়ন করা। (খ) জান্নাতে প্রবেশের জন্য ওটাই অপরিহার্য গুণ। যে ব্যক্তি এই গুণে গুণান্বিত নয়, সে ব্যক্তি জান্নাতের অধিকারী নয়।

৮. শুদ্ধিতা অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট কোন আমল নেই। বরং ইসলামের সমস্ত রীতি-পদ্ধতি, আক্বীদা-বিশ্বাস ও আচরণবিধি সব কিছুরই শেষ ফল গিয়ে দাঁড়ায় তাযকিয়াহ বা আত্মার পরিশুদ্ধি।

৯. পরবর্তীকালে তাছাউওফের নামে ইছলাহে নাফস বা আত্মশুদ্ধির বহু তরীকা সৃষ্টি হয়েছে। যা তারবিয়াত ও ইবাদতের গতি পেরিয়ে আক্বীদা ধ্বংস করা ও শরী'আত দলনের ক্ষেত্র অতিক্রম করেছে। তারা আল্লাহকে

ছেড়ে অন্যের ইবাদত তথা শিরকের মহাপাতকে লিপ্ত হয়েছে এবং অদ্বৈতবাদ, সর্বেশ্বরবাদ প্রভৃতি নানাবিধ শিরকী মতবাদ আবিষ্কার করেছে। ফলে পাপীরাই সেখানে সৎলোকের চাইতে অধিক মর্যাদাবান হিসাবে গণ্য হয়।

১০. ছূফী মতবাদের মুকাবিলায় একটি ফিক্বহী জড়তা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। যা কুরআন ও সুন্নাহ্র বিধানগুলিকে মেশিনের ছাঁচের ন্যায় তাদের মনগড়া উছূলে ফিক্বহের পরিভাষার ছাঁচে ঢেলে দেয়। ফলে মানুষ কিতাব ও সুন্নাহ্র মূল উৎস হ'তে দূরে সরে যায়। এইসব ছাঁচ বহু হালালকে হারাম করে এবং হারামকে হালাল করে *(৪২ পৃ.)*।

১১. সালাফী তরীকা উপরোক্ত ছূফী ও ফিক্বহী তরীকার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। ফলে তাযকিয়াহ আল্লাহ্র দ্বীনের যথাস্থানে রক্ষিত হয়েছে। এর জন্য সে শরী'আত সম্মত পদ্ধতি সমূহ অনুসরণ করেছে, যা কিতাব ও সুন্নাহতে মওজূদ রয়েছে। ঐ দু'টির বাইরে তাযকিয়াহ নেই এবং ঐ দু'টি ব্যতীত তাযকিয়াহ কখনোই হাছিল হ'তে পারে না *(৪৩ পৃ.)*।

১২. সালাফী তরীকা ঐসব যাহেরী কট্টর মতবাদীদেরকেও বাতিল গণ্য করেছে, যারা দলীল নিয়ে চলে, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ভুলে যায়।... এই তরীকা হ'ল সংশোধন, প্রশিক্ষণ, আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল ও শুদ্ধিতা অর্জনের জন্য। এখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত সে কাউকে শ্রেষ্ঠতম নমুনা মনে করে না। তিনি মানবজাতির মধ্যে আত্মার দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা পবিত্র, মর্যাদার দিক দিয়ে সর্বোচ্চ, চরিত্রে সুদৃঢ় এবং তরীকা ও পদ্ধতিতে শ্রেষ্ঠতম পথ প্রদর্শক *(৪৩-৪৪ পৃ.)*।

১৩. সালাফী দাওয়াতের উদ্দেশ্য সমূহ ৪টি : (ক) খাঁটি মুসলিম তৈরী করা (খ) এমন একটি মুসলিম সমাজ কায়েম করা যেখানে আল্লাহ্র কালেমা উন্নত থাকবে এবং কুফরীর কালেমা অবনমিত হবে (গ) আল্লাহ্র জন্য দলীল কায়েম করা (ঘ) আমানত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকট ওযর পেশ করা।

১৪. সালাফী তরীকায় দাওয়াত দানকারীকে অবশ্যই নিম্নোক্ত দু'টি বিষয়কে তার অন্যতম প্রধান বিষয় হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে।-

(ক) (দাওয়াতের) আমানত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকট ওযর পেশ করা। (খ) হঠকারী বান্দাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র জন্য দলীল কায়েম করা। এরপর বাকী দু'টি উদ্দেশ্য আল্লাহ্র উপরে ন্যস্ত করতে হবে। চাইলে তিনি তাড়াতাড়ি সে দু'টি বাস্তবায়িত করবেন, চাইলে দেরীতে করবেন। সে দু'টি হ'ল : (ক) মানুষের হেদায়াত পাওয়া এবং (খ) তাঁর শরী'আত যমীনে কায়েম হওয়া *(৫৭-৫৮ পৃ.)*।

১৫. সালাফী দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য সমূহ ৩টি : (ক) তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা (খ) ঐক্যের বাস্তবায়ন (গ) ইসলামের বুঝকে সহজবোধ্য করা।

১৬. সালাফী দাওয়াত হ'ল উম্মতের ঐক্যের দাওয়াত। যা ব্যবহারিক জীবনে একক বিধান চালু করতে চায় কিতাব ও সুন্নাহ্র ভিত্তিতে। ইমামদের কথা তারা গ্রহণ করবে। কিন্তু কোন একজনের রায়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবে না। অতএব হে আমার জাতি! এই দাওয়াতের মধ্যে কোন ত্রুটি আছে কি? *(৭৮ পৃ.)*।

১৭. কিন্তু এই সহজ-সরল দ্বীন আজ মানুষের নিকট অবোধ্য করে তোলা হয়েছে এবং পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ হ'তে সরাসরি ফায়েদা হাছিলের পথ লোকদের জন্য রুদ্ধ করা হয়েছে। ফলে ইসলাম এখন রূপকথার গল্প সমূহের মত হয়ে গেছে। এর কারণ হ'ল ইসলাম বিষয়ক শাখা-প্রশাখা সমূহের জন্য বিভিন্ন পরিভাষার ছড়াছড়ি। ইলম ও মা'রেফাতের (নামে আলাদা পরিভাষা) সৃষ্টি হ'ল, যাতে ইসলামের কিছুই নেই।... আরবী সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকেও দেখছি যে, কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে কিছুই জ্ঞান রাখেন না, সামান্য কিছু ব্যতীত। এমনিভাবে উছূলে ফিক্বহে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি তাওহীদ ভাল বুঝেন না। এমনকি তিনি ওযূর নিয়মটাও ভালভাবে জানেন না *(৭৯ পৃ.)*।

১৮. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বর্তমানে এমন সব আলেম তৈরী করছে, যারা মিম্বরে ও স্টেজে দাঁড়িয়ে লোকদের নিকট উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা করেন। কিন্তু ছহীহ ও মওযূ' হাদীছ এবং বানাওয়াট কথাসমূহের পার্থক্য বুঝেন না। এভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন শাখার উপরে পৃথক পৃথক বিশেষজ্ঞ তৈরী করছে, যারা ইসলামের সামষ্টিক জ্ঞান অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছেন *(৮০ পৃ.)*।

১৯. সালাফী দাওয়াতের প্রধান প্রচেষ্টা হ'ল মানুষের জন্য ইসলামের বুঝকে সহজ করে দেওয়া। আর তা হ'ল সমস্ত মানুষের নিকট কিতাব ও সুন্নাহ্র শিক্ষা ও জ্ঞান সহজ ও স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়ার সমস্ত পথ খুলে দেয়া। যাতে এই জ্ঞান সকলের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়।... বরং ইসলামের জ্ঞান হবে সকলের জন্য উন্মুক্ত। যেমন মুক্ত বায়ু থেকে আমরা নিঃশ্বাস নিয়ে থাকি *(৮০ পৃ.)*।

২০. এই সহজবোধ্যতা বিগত যুগে যত না যরূরী ছিল, বর্তমান যুগে তা আরও অধিক যরূরী এবং আমাদের জন্য অধিক প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে। কেননা এ যুগের মানুষ তাদের সমস্ত জীবনটাই বলতে গেলে দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জনের মধ্যে লিপ্ত রাখে।... আর সে কারণেই সালাফী শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি একটি পূর্ণাঙ্গ ও নিরাপদ পদ্ধতি। কেননা এটি মানুষের কাছ থেকে খুব কম সময় নেয় এবং তাকে সর্বাধিক ফায়েদা প্রদান করে *(৮১ পৃ.)*।

২১. এই ফায়েদাটিই হ'ল সালাফী তরীকায় পদচারণার প্রধান বৈশিষ্ট্য। যা নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর তরীকা। যা তিনি অতি অল্প আয়াসে ও স্বল্প প্রচেষ্টায় সমস্ত উম্মতকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাঁর ছাহাবীগণও সেটা করে গিয়েছেন।... এভাবে আমরা মনে করি সালাফী উত্তরসুরীগণ তাদের প্রথম যুগের নেতৃবৃন্দের ন্যায় উপরোক্ত বিশেষ গুণ সমূহের অধিকারী হবে *(৮২ পৃ.)*।

Contents

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই ও প্রচারপত্র সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৫ম সংস্করণ (২০/=) **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=) **৩.** আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস) ২০০/= **৪.** ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=) **৫.** ঐ, ইংরেজী (২০০/=) **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১২০/=) **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১০০/=) **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৪৫০/= **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩০০/=) **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=) **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১২/=) **১৩.** তিনটি মতবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=) **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=) **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=) **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=) **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=) **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১৫/=) **২২.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ (১০/=) **২৩.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (১০/=) **২৪.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=) **২৫.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয় (১০/=) **২৬.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=) **২৭.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=) **২৮.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৫ম সংস্করণ (২০/=) **২৯.** তালাক ও তাহলীল, ২য় সংস্করণ (২০/=) **৩০.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=) **৩১.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=) **৩২.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=) **৩৩.** হিংসা ও অহংকার (৩০/=) **৩৪.** বিদ‘আত হ’তে সাবধান, অনু: (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=) **৩৫.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনু: (আরবী) -শায়খ আলবানী (১৫/=)। **৩৬.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনু: (আরবী) -আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক (৩৫/=)।

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মুহাম্মাদী, ৫ম প্রকাশ (১০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/=) **২.** ঐ, ইংরেজী (৫০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৩য় প্রকাশ (১২/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো‘আ, ৩য় সংস্করণ (৩৫/=) **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=) **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=) **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনু: (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান (১৮/=)।

লেখক : শামসুল আলম ১. শিশুর বাংলা শিক্ষা (৩০/=)।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনু: (আরবী) -ড. নাছের বিন সোলায়মান (৩০/=) **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=) **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনু: -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (২৫/=) **৪.** মুনাফিকী, অনু: -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (২৫/=) **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনু: -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (২০/=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=) **২.** শারঈ ইমারত, অনু: (উর্দূ) ২০/=।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=) **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)।

আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১. জাগরণী (২৫/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (২৫/=) **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৫০/=) **৩.** জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ১৫/= **৪.** ছালাতের পর পঠিতব্য দো‘আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৪০/=।

প্রচার বিভাগ : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ১. জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’-এর ভূমিকা (২৫/=)। **এছাড়াও রয়েছে প্রচারপত্র সমূহ।**